মাসুদ রানা
পাগল বৈজ্ঞানিক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনা
Sewam Sam
Sewam Sam

মাসুদ রানা

পাগল বৈজ্ঞানিক

কাজী আনোয়ার হোসেন

বহুদিন বিদেশে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে
দেশে ফিরে আসছিল রানা।
পরদিন রিজার্ভ করা হয়েছে প্লেনের সিট।
এমনি সময়ে ইলেকট্রনিকসের এক দোকানের সামনে
দেখা পেল সে কবির চৌধুরীর।
রানার চিরশত্রু কবির চৌধুরী।
সেই আশ্চর্য প্রতিভাবান পাগল বৈজ্ঞানিক কবির চৌধুরী।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

পাগল বৈজ্ঞানিক

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল, ১৯৭৬

এক

উলঙ্গ ঠিক বলা যায় না ওকে।

ছোট্ট একটা সাদা কাপড়ের ত্রিভুজ রয়েছে মেয়েটির পরনে। টু-পিস বিকিনির বাকি এক চিলতে সিল্ক দিয়ে কষে বাঁধা রয়েছে বুক। বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে সাদা কনভার্টিবল স্পোর্টস কার। হাওয়ায় নিশানের মত উড়ছে লম্বা সোনালী চুল।

একহাতে স্টিয়ারিং ধরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে মেয়েটা রাস্তার দিকে। এঁকে বেঁকে চলে গেছে পিচ-ঢালা রাস্তা ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীর ঘেঁষে। পড়ন্ত বিকেলের ম্লান রোদ পড়ে ঝিলমিলে সোনালী হয়ে গেছে সাগরের এক অংশ। নীরবে উড়ছে সী-গাল ঘুরে ঘুরে। শান্ত, সমাহিত, স্নিগ্ধ পরিবেশ।

ডানদিকে মোড় নিল গাড়িটা। সোজা সমুদ্রের দিকে চলে গেছে একটা 'কজওয়ে'। ব্রিজটা ডিঙিয়েই দেখা গেল কলিনকে।

সিকি মাইল দূরে গার্ড-রেইলে হেলান দিয়ে ছিপ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল কলিন, ঘাড় ফিরিয়ে সাদা কনভার্টিবলটাকে দেখল। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। মেয়েটার দিকে হাত নেড়ে রীল ঘুরিয়ে তুলে ফেলল বড়শী, ছিপটাকে রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে এল কয়েক পা। গাড়ির গতি কমিয়ে ডান হাতটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে একটা উড়ন্ত চুম্বন উপহার দিল মেয়েটি ওকে। প্রাথমিক দু'য়েকটা কথার পর নামবে ওরা সাগরে। মনের সুখে সাঁতার কেটে উঠে আসবে বালুকা বেলায়। তারপর কি ঘটবে ভাবতে গিয়ে আরও একটু বিস্তৃত হলো কলিনের মুখের হাসি। আরও এক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

ও কি! হঠাৎ বেড়ে গেল কেন গাড়ির গতি!

সগর্জনে ছুটে আসছে কনভার্টিবল সোজা ওর দিকে। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল ওর মুখের হাসি হাসি ভাবটা, পরমুহূর্তে ফুটে উঠল তীব্র আতঙ্ক। পিছাতে গিয়ে হোঁচট খেল সে। বুকের ওপর উঠে এল গাড়িটা। ভয়ে কুঁকড়ে বসে পড়েছে কলিন। দড়াম করে সামনের বাম্পারের সঙ্গে ধাক্কা খেল ওর বুকটা। ছিটকে গিয়ে পড়ল সে গার্ড-রেইলের উপর। প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরাল মেয়েটা শেষ মুহূর্তে। গার্ড-রেইলের সঙ্গে প্রেমিকের দেহটা থেঁতলে পিষে দিয়ে এগিয়ে গেল কয়েক গজ। জোরে ব্রেক কষে থামাল গাড়িটা। চি হিঁ হিঁ আওয়াজ তুলল টায়ারগুলো পিচের ওপর দিয়ে গজ দুয়েক ছেঁচড়ে যাওয়ায়।

ঘাড় ফিরিয়ে কলিনকে একবার দেখে নিল মেয়েটা, তারপর ব্যাক গিয়ার দিয়ে নিয়ে এল গাড়িটা গার্ড-রেইলের খুব কাছ ঘেঁষে। আবার চ্যাপ্টা হয়ে গেল একতাল মাংসপিণ্ডের মত কলিনের রক্তাক্ত শরীরটা, অদৃশ্য হয়ে গেল চাকার নিচে। আরও খানিকটা পিছিয়ে আবার সামনের দিকে চলল গাড়ি। এবার কলিনের গলার ওপর দিয়ে চলে গেল পর পর দুটো চাকা। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে কলিনের থেঁতলে যাওয়া শরীরের ওপর দিয়ে আর একবার ডিঙাল প্রেমিকা। এবার আর থামল না—গর্জন তুলে ফিরে চলে গেল গাড়িটা শহরের দিকে।

ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের ভাড়াটে ফিশিং বোটটাকে লক্ষই করেনি মেয়েটা। ব্রিজের নিচে ছিল ওটা। দূর থেকে পুরো ঘটনাটাই দেখল সন্ডার্স। যখন কলিনের পাশে এসে পৌঁছল তখনও প্রাণ-স্পন্দন রয়েছে কলিনের দেহে। মুখটা একেবারে থেঁতলে গেছে। চেনার উপায় নেই। থুতনির যেটুকু অংশ ভাল আছে তার ওপর দিয়ে কষ গড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে রক্ত। হাত-পা যে ভঙ্গিতে পড়ে আছে তাতে বোঝা যায় মাল্‌টিপল্ ফ্র্যাকচার হয়েছে একাধিক জায়গায়। হাঁটু গেড়ে বসে কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করল ক্যাপ্টেন সন্ডার্স, 'এই যে মিস্টার, কি হয়েছে? শুনতে পাচ্ছেন?'

সামান্য একটু ফাঁক হলো চোখের পাতা। রক্তাক্ত ঠোঁটদুটো কাঁপল একটু। কিছু বলবার চেষ্টা করছে সে। একটু আওয়াজ বেরোল গলা দিয়ে। আরও খানিকটা ঝুঁকে এল সন্ডার্স। 'এক···' ফুঁপিয়ে শ্বাস নিল কলিন। 'অ্যাকোয়া···' আর শোনা গেল না কিছু। শিথিল হয়ে গেল মুখের পেশী। চোখের পাতা বুজে গেল ওর। মাথাটা একটু হেলে পড়ল ডানদিকে।

পাল্‌স দেখে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন সন্ডার্স।

প্যারিসের অত্যন্ত বিখ্যাত এক রেডিও এবং ইলেকট্রোনিকস-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শো-কেস পর্যবেক্ষণ করছে রানা। মাস চারেক আগে ঢাকা থেকে রওনা হবার সময় এক লম্বা লিস্টি দিয়েছিল গিলটি মিঞা। 'রানা এজেন্সী'র জন্যে গোটাকয়েক ইলেকট্রোনিক ডিভাইস দরকার তার। বারবার করে সাবধান করে দেয়া সত্ত্বেও লিস্টটা হারিয়ে ফেলেছে রানা। কি কি যন্ত্রপাতি চেয়েছিল গিলটি মিঞা আন্দাজও করতে পারছে না, কারণ একবারও চোখ বুলায়নি সে লিস্টের ওপর। ইউরোপের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ ব্যাপারটা মনে পড়ায় একেবারে অকূল পাথারে পড়ে গেছে সে। আগামীকাল সকালের টিকেট কেটে বসে আছে সোহানা, এখান থেকে গিলটি মিঞার সঙ্গে যোগাযোগ করবার কোন উপায় নেই, কাজেই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়বারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। একেবারে খালি হাতে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। গিলটি মিঞা এমনিতেও চটবে, ওমনিতেও—তবু যদি যা-হোক-কিছু দিয়ে ওকে বুঝ দেয়া যায় সে চেষ্টা করাই ভাল।

বিরাট স্বচ্ছ কাঁচের ওপাশে সাজানো যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর নজর

বোলাচ্ছে আর চিন্তা করছে রানা ঠিক কি ধরনের কি জিনিস গিলটি মিঞার পক্ষে চাওয়া সম্ভব, কি নিলে খুশি হবে। একটা নতুন মডেলের থ্রী-হেড ফিনিশেড পছন্দ হলো ওর, কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারল এ জিনিস কিছুতেই ব্যবহার করবে না গিলটি মিঞা। ব্যক্তিগত প্রত্যেকটা ব্যাপারে ওর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে, নিজের রুচির বাইরে ওকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। আচ্ছা, ফটো ইলেকট্রিক সেল বা ইনফ্রা রে-র কোন বার্গলার্স অ্যালার্ম জাতীয় কিছু নেবে? বলেছিল, অফিস চালাতে হলে ওর ওসব জিনিস দরকার… কি কি দরকার হতে পারে একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটারের? চট করে মনে পড়ল টেপ-রেকর্ডার, মিনি মাইক্রোফোন, ইত্যাদি কয়েকটা যন্ত্রপাতির কথা।

সাত-পাঁচ ভেবে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। মেইন এন্ট্রান্সের সামনেই নো-পার্কিং লেখা একটা সাইনবোর্ডের গায়ে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সাদা রঙের কনভার্টিবল। পার্কিং অফেন্সের জন্যে ঠিক ওয়াইপারের নিচে সেলোটেপ দিয়ে আঁটা রয়েছে পুলিসের হলুদ পার্কিং টিকেট। হাসল রানা—এই ভয়েই প্রায় পৌনে একমাইল দূরে জায়গামত গাড়ি পার্ক করে পায়ে হেঁটে এসেছে সে এতদূর।

বাহ্! চমৎকার ফিগার তো মেয়েটার! এমন আকর্ষণীয় বডি সচরাচর চোখে পড়ে না। দোকান থেকে বেরিয়েই সামনে পার্ক করা সাদা গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। হাতে মাঝারি সাইজের একটা পার্সেল। পার্সেলটা পেছনের সীটে রেখে ড্রাইভিং সীটে বসল মেয়েটা। নজর গেল ওর পার্কিং টিকেটটার দিকে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওটা নিয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিল। তারপর ওপাশের দরজাটা খুলে দিল ওর সঙ্গীর জন্যে। এতক্ষণ মেয়েটাকেই লক্ষ করছিল রানা, বেশ কিছুটা পেছনে যে ওর আরেক সঙ্গী রয়েছে সেটা খেয়াল করেনি। আবছাভাবে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দোকানে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল রানা। ঝট করে চাইল আবার।

কবির চৌধুরী না?

অস্বাভাবিক লম্বা এক লোক, প্রকাণ্ড এক মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, জুলফির কাছে পাক ধরেছে। উঠে বসল লোকটা প্যাসেঞ্জার সীটে। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানার দিকে। তিন সেকেন্ড স্থির থাকল দৃষ্টিটা রানার ওপর, তারপর নির্বিকার ভঙ্গিতে ফিরিয়ে নিল চোখ। হুশ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

একলাফে রাস্তার ওপর চলে এল রানা। ট্যাক্সির জন্যে চাইল এদিক ওদিক। একটা খালি ট্যাক্সিও চোখে পড়ল না। নিজের ল্যান্সিয়াটা রয়েছে পৌনে একমাইল দূরে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। পিছু নেয়ার কোন উপায় নেই। অসহায় বোধ করল রানা। কিন্তু করবার কিছুই নেই।

ফুটপাথ ডিঙিয়ে দোকানে ঢুকল রানা। এখানে কিছু তথ্য পাওয়া অসম্ভব নয়। কয়েক পদের বার্গলার্স অ্যালার্ম, মিনি ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, মাইক্রোফোন, ইত্যাদি পছন্দ করল সে কয়েকটা কাউন্টারে। প্রত্যেক

কাউন্টারেই জিজ্ঞেস করল স্বর্ণকেশী আর তার সঙ্গীর কথা। ইনফ্রা রেড লেন্স ফিট করা একটা শক্তিশালী বিনকিউলার কিনতে গিয়ে অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল সেলসগার্লের কাছে।

'হ্যাঁ। চিঠিতে স্পেশাল অর্ডার প্লেস করেছিলেন ওঁরা আগেই, আজ কালেক্ট করে নিয়ে গেলেন। কেন বলুন তো?'

'ভদ্রলোক আমার পরিচিত। দেশী মানুষ। দূর থেকে দেখলাম গাড়িতে উঠছেন। তাড়াতাড়ি হেঁটেও ধরতে পারলাম না, পৌঁছবার আগেই ছেড়ে দিল গাড়ি। যাক, ভালই হলো, আপনার কাছ থেকে ওঁর ঠিকানাটা পাওয়া যাবে। ওঁর সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত প্রয়োজন।'

একটু ইতস্তত করল মেয়েটা। রানার চোখের দিকে চেয়ে আশ্বাস খুঁজল। তারপর বলল, 'আপনি যখন বলছেন ভদ্রলোক আপনার বন্ধু, আপনাকে ঠিকানা দেয়া হয়তো তেমন দোষের কিছু হবে না। কিন্তু বুঝতেই পারছেন আমাদের কাস্টোমারদের সম্পর্কে এরকম ইনফরমেশন দেয়ার ঠিক নিয়ম…'

'বুঝতে পারছি,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আগামীকাল দেশে ফিরে যাচ্ছি আমি, হাতে সময় নেই, তাই আপনাকে বিরক্ত করা।'

'না, না। বিরক্ত কিসের।' একটা ফাইল বের করে কয়েকটা পাতা উল্টে একটা কাগজে চোখ রাখল মেয়েটা, কয়েক সেকেন্ড ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনার বন্ধুর নাম কি?'

প্রমাদ গুনল রানা। কবির চৌধুরী নিশ্চয়ই স্বনামে চিঠি দেয়নি ওদের। কি নাম নিয়েছে তা রানা জানবে কেমন করে? বলল, 'দেখুন, ও আমার একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু। চৌধুরী বলে ডাকি আমরা ওকে। ওর পুরো নামটা জানবার দরকার হয়নি আমার কোনদিন।'

ফাইলটা বন্ধ করে আবার যথাস্থানে রেখে দিল সেলসগার্ল। 'দুঃখিত। উনি চৌধুরী নন। আপনি নিশ্চয়ই চিনতে ভুল করেছেন।' যেন ব্যাপারটার এইখানেই সমাপ্তি ঘটেছে, এমনি ভঙ্গিতে বিনকিউলারের মেমো কেটে দিল মেয়েটা।

আর কথা না বাড়িয়ে দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা।

'না, স্যার। আমি নিজের চোখে দেখেছি। কোন সন্দেহ নেই।'

'এক মিনিট।' পরিষ্কার ভেসে এল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। ঠিক ত্রিশ মিনিট পর আবার কথা বলে উঠলেন তিনি, 'খুবই আশ্চর্যের কথা। ছ'মাস আগে ওকে বম্বে থেকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে চালান করা হয়েছিল। এখনও ওর কলকাতাতেই থাকবার কথা—অথচ তুমি বলছ… আচ্ছা এক কাজ করো। স্ট্যান্ড বাই—আধঘণ্টার মধ্যেই খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি আমি লেটেস্ট নিউজ।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার। ওভার অ্যান্ড আউট।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। বিশাল, কাঁচ-ঢাকা মেহগনি ডেস্কের ওপাশে রিক্লাইনিং চেয়ারে বসে মিটিমিটি হাসছেন ফিলিপ কার্টারেট রানার দিকে চেয়ে। ইন্টারপোলের নার্কোটিক সেকশনের বাঘা চীফ ফিলিপ কার্টারেট। কিন্তু এখন যে অফিসটায় বসে আছেন সেটা হচ্ছে ফ্রান্সের গুপ্তচর বিভাগ ডুক্সেম ব্যুরোর চীফের খাস কামরা। এখান থেকে অবসর গ্রহণ করেই ইন্টারপোলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু হঠাৎ জরুরী তলবে ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে আবার ডুক্সেম ব্যুরোতে। ঠিক দু'হপ্তা আগে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত পাওয়া গেছে প্রাক্তন চীফকে তাঁর নিজের বেডরুমে। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কাজের ভার নিতে হয়েছে ফিলিপ কার্টারেটকে।

আজ থেকে চার মাস আগে এই বৃদ্ধের কাছেই সাহায্য চাইবার জন্যে রওনা হয়েছিল রানা বাংলাদেশ থেকে। রানার আগে আরও দুই একজন এসেছিল, কট্টর বুড়োকে ভজাতে না পেরে বিফল হয়ে ফিরে গিয়েছিল দেশে—কাজেই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে চলেছিল সে প্যারিসের পথে বন্ধু সালেহীনের লাল ল্যান্সিয়ায় চেপে। পথে প্রতিযোগিতার ছলে পরিচয় হয়ে গেল মহিলা গ্র্যান্ড-প্রি চ্যাম্পিয়ান জুলিয়ার সাথে। গ্র্যান্ড-প্রি প্রতিযোগিতায় নামার জন্য চেপে ধরল ওকে জুলিয়া—আব্দার ধরল ব্লু অ্যাঞ্জেল টীমের হয়ে চালাতে হবে গাড়ি। রানা চলেছে কাজে, এই রকম একটা অনুরোধ রক্ষা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই নিরাশ করতে হলো মেয়েটাকে। পরদিন দুপুরবেলা নিসের এক রেস্তোরাঁয় বসে লাঞ্চ সারছে রানা, এমনি সময় গায়ে পড়ে আলাপ করল ওর সঙ্গে এক বৃদ্ধ। জানা গেল, লোকটা জুলিয়ার বাবা, গত বছরের নিহত চ্যাম্পিয়ান পল ছিল তার একমাত্র পুত্র। লোকটার ধারণা পলের মৃত্যুটা সাধারণ কোন দুর্ঘটনা নয়, হত্যা করা হয়েছে তাকে, ভয়ানক কোন ষড়যন্ত্র রয়েছে ওর মৃত্যুর পেছনে, রানা যদি তাকে এই রহস্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে, চিরকৃতজ্ঞ থাকবে বৃদ্ধ রানার কাছে। প্রস্তাবটা ভদ্রভাবে কি করে প্রত্যাখ্যান করা যায় ভাবছিল রানা, এমনি সময়ে চমকে উঠল বৃদ্ধের পরবর্তী কথায়। জানতে পারল এই লোকই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ফিলিপ কার্টারেট। এরই কাছে চলেছিল সে সাহায্যের আশায়।

নিজের পরিচয় গোপন রেখে সাহায্য করেছিল রানা বৃদ্ধ ফিলিপ কার্টারেটকে। ধ্বংস করে দিয়েছিল পল কার্টারেটের হত্যাকারীদের। উল্কার মত রেসিংট্র্যাকে দেখা দিয়েছিল ইটালিয়ান ড্রাইভার মরিস রেনার, অর্থাৎ মাসুদ রানা—ঠিক তিনমাস পর উল্কার মতই উবে গিয়েছিল বেমালুম। জয় করে নিয়েছিল ফিলিপ কার্টারেটের আস্থা। রাজি হয়েছিল ফিলিপ কার্টারেট ইন্টারপোলের ছত্রছায়ায় অ্যামস্টার্ডামে গিয়ে রানাকে কিছু কাজের সুযোগ দিতে।

সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করে, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর এক ড্রাগ রিঙ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে ফিরে এসেছে রানা প্যারিসে। তিনদিন বিশ্রামের পর

আগামীকাল দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ওর। এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে রানাকে তাঁর অফিসে এসে হাজির হতে দেখে অত্যন্ত অবাক হয়েছেন ফিলিপ কার্টারেট। ঢাকার সঙ্গে অয়্যারলেসে কথা বলবার অনুমতি চাওয়ায় বিস্মিত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বিস্মিত হয়েছেন কয়েকটা তথ্য সংগ্রহ করে দেয়ার অনুরোধে। কোন প্রশ্ন না করেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিলেন রানার দক্ষ হাতে রেডিও অপারেট করবার ক্ষমতা, কথাবার্তার কিছুই বোঝেননি তিনি—বাংলায় কথা হচ্ছিল, কিন্তু একটা নাম যতবারই উচ্চারণ করা হলো ততবারই কিসের যেন একটা ঝঙ্কার শুনতে পেলেন তিনি, টোকা পড়ল যেন স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রাখা কোন সেতারের চিকারির তারে। মৃদু হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা কি বলো তো, রানা? ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজ হলো?'

'কাজ চলছে,' বলল রানা। 'আধঘন্টার মধ্যেই খোঁজ খবর নিয়ে জানানো হবে আমাকে। কিন্তু আপনার অসুবিধে হলে আমি না হয়...'

'অসুবিধে নয়, কৌতূহল হচ্ছে। কিসের এত খোঁজ করছ তুমি, রানা? ব্যাপারটা কি? ঝড়ের বেগে এসে দাবি করছ তোমার অয়্যারলেস সেট চাই, একটা বিনকিউলারের ক্যাশমেমো দিয়ে চাইছ আগের কাস্টোমারের নাম ঠিকানা, আবার সেই দোকানের সামনে পার্কিং টিকেট পাওয়া গাড়ির মালিকের নাম-ধামও তোমার চাই। ঘটনাটা কি?'

'পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম ক্রিমিনালকে এই কিছুক্ষণ আগে দেখলাম প্যারিসে। কুখ্যাত মাফিয়া বা কোসানোস্ট্রা ওর ক্ষমতার কাছে নস্যি। লোকটা নিজে একজন মস্ত বড় প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক, কিন্তু মিস্ গাইডেড। বারকয়েক জোর সংঘর্ষ হয়েছে ওর সঙ্গে আমার, একের পর এক ওর মারাত্মক সব প্ল্যান আমি বানচাল করে দিয়েছি। শেষবার বম্বেতে আমি নিজের হাতে গুলি করে ওর ডানহাতের কব্জি ভেঙে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছিলাম ওকে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, জেলের ঘানি টানছে লোকটা। কিন্তু আশ্চর্য, খানিক আগে ওকে দেখলাম, দিব্যি উঠে বসল একটা সাদা কনভার্টিবলে, সাঁ করে বেরিয়ে গেল আমার চোখের সামনে দিয়ে।'

'নামটা কেন জানি বেশ পরিচিত ঠেকছে, রানা। আচ্ছা, এই লোকই কি ইটালীর...'

'ঠিক ধরেছেন। কাসা বিলাভিস্টার সেই পাগল বৈজ্ঞানিক। আগ্নেয়গিরির মধ্যে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সব মনে পড়েছে!' বিস্ফারিত হয়ে গেল ফিলিপ কার্টারেটের চোখ। 'সব্বোনাশ।' মাথা চুলকালেন সিলিঙের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। 'বড় ভয়ঙ্কর কথা। এই লোক প্যারিসে কেন?'

'আমিও সেই কথাটাই জানতে চাই।'

'কিন্তু ওর নাম-ঠিকানা নিয়ে তুমি কি করবে? তুমি তো কালই ফিরে

যাচ্ছ দেশে।'

'সেটা নির্ভর করবে···' থেমে গেল রানা টেবিলের ওপর ইন্টারকমের বাযার বেজে উঠতেই।

একটা বোতাম টিপে হাঁক ছাড়লেন ফিলিপ কার্টারেট, 'ইয়েস, মাদমোয়াজেল।' সেক্রেটারির বক্তব্য শুনতে পেল না রানা। কয়েক সেকেন্ড নীরবে শুনে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'ঠিক আছে। নিয়ে এসো। সেই সাথে দু'কাপ কফি আনতে ভুলো না।' রানার দিকে চেয়ে হাসলেন, 'এসে গেছে তোমার ইনফর্মেশন।'

রিক্লাইনিং চেয়ারে হেলান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সোজা হয়ে বসতে হলো ফিলিপ কার্টারেটকে। ডেস্কের কাছেই একটা র‍্যাকের ওপর সাজানো ডজনখানেক টেলিফোন। দ্বিতীয়বার রিঙ হতেই গোক্ষুরের মত ছোবল দিয়ে তুলে নিলেন একটা রিসিভার। দশ সেকেন্ড চুপচাপ শুনবার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিপার্টমেন্ট এক্স কি সন্দেহ করছে এই লোকটাই—' বলতে বলতে থেমে গেলেন ফিলিপ কার্টারেট। অল্পক্ষণ পর বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা যোগাযোগ করো ডিপার্টমেন্ট এক্স-এর সাথে, ওদের মতামতটাও জানা দরকার।' রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ারের পিঠে হেলান দেয়ার আগেই বেজে উঠল আরেকটা ফোন। রিসিভার কানে তুলেই ভুরুজোড়া কুঞ্চিত হয়ে গেল বৃদ্ধের, 'আশ্চর্য। কম্পিউটার সেকশন বলছে এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে আর্থারের মৃত্যুর! ···কলিনেরও? ও. কে. ফাইলটা পাঠাও। হ্যাঁ, এক্ষুণি।'

ট্রে হাতে ঘরে এসে ঢুকল সেক্রেটারি। ছিমছাম গড়ন। বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। রানার সাথে চোখাচোখি হতেই ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস দেখা দিল মেয়েটির। কফি আর বিসকিট সার্ভ করে বৃদ্ধের হাতে একটা মুখ-খোলা খাম দিয়ে রানাকে আর একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে গেল রোজমেরী ডুফ।

কফিতে চুমুক দিয়ে এনভেলাপ থেকে একটা কাগজ বের করে তার মধ্যে ডুবে গেলেন ফিলিপ কার্টারেট; হঠাৎ চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, লোকটার ডান হাতের কব্জি গুঁড়ো করে দিয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ। ডানহাত।' মৃদু হাসল রানা। 'তখন জানতাম না যে একটা গুলিশূন্য পিস্তল তাক করেছিল ও আমার বুকের দিকে।'

আবার হাতের কাগজে মন দিলেন বৃদ্ধ। কাগজটা শেষ হওয়ার আগেই ফাইল হাতে ঘরে ঢুকল আবার রোজমেরী ডুফ। রানার উপস্থিতি বেমালুম ভুলে গিয়ে ফাইলের মধ্যে ডুবে গেলেন ফিলিপ কার্টারেট। সেই সুযোগে আরও একটু আন্তরিক হাসি উপহার দিল ডুফ রানাকে, বেরিয়ে গেল।

ফাইলের কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে আবার চোখ তুললেন ফিলিপ কার্টারেট। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন রানাকে, এমনি সময় আবার টেলিফোনের রিঙ শুনে ছোবল দিলেন রিসিভারের ওপর। চোখমুখ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠল বৃদ্ধের। কিছুক্ষণ শোনার পর বললেন, 'ঠিক আছে। বুঝলাম। তুমি

প্রোজেকশন রুমে ইনফর্ম করো, আসছি আমরা।' রিসিভার নামিয়ে রেখে জ্বলজ্বলে চোখে চাইলেন তিনি রানার মুখের দিকে। 'আগামীকাল খুব সম্ভব তোমার যাওয়া হচ্ছে না, রানা। কফিটা খেয়ে নাও, তোমাকে একটা ফিল্ম দেখাব।'

রেডিও সিগন্যাল পাওয়া গেল। ঝুঁকে পড়ল রানা অয়্যারলেস সেটটার ওপর। নিজের কোড নাম্বার দিতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল মেজর জেনারেল রাহাত খানের গম্ভীর কণ্ঠস্বর 'ঠিকই দেখেছ তুমি, রানা। এইমাত্র জানা গেল, আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে কবির চৌধুরীর জায়গায় রয়েছে এক বদ্ধ উন্মাদ। মুখে রবারের মুখোশ—হুবহু কবির চৌধুরীর চেহারা। ডানহাতে প্লাস্টার। ওটা কেটে দেখা গেছে কোনদিন জখম হয়নি ওর কজি। জেল কর্তৃপক্ষ টেরই পায়নি কবে কখন বদলি হয়ে গেছে কয়েদী। ওরা ধারণা করেছিল কবির চৌধুরীই জেলে থাকতে থাকতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে ধীরে ধীরে।'

'তাহলে আমি কি কিছুদিন ফ্রান্সেই থাকছি?' নিজের ইচ্ছেটা ব্যক্ত করল রানা।

'ইয়েস। ডেফিনিটলি। মনে হচ্ছে : দিস ম্যান ইজ আপটু সামথিং ভেরি স্পেশাল। হি মাস্ট বি ফাউন্ড অ্যান্ড স্টপ্‌ড্ অ্যাট এনি কস্ট—আই রিপিট, মাস্ট বি ফাউন্ড অ্যান্ড স্টপ্‌ড্ অ্যাট এনি কস্ট। হি ইজ এ পোটেনশিয়াল ডেঞ্জার টু ম্যানকাইন্ড। আমি ইন্টারপোল আর ডুক্সেম ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আশা করা যায়, ওর সম্পর্কে সবকিছু জানালে ফ্রেঞ্চ গভমেন্টের ফুল অফিশিয়াল কোয়াপরেশন তুমি পাবে।'

'সোহানাকে কি…'

'না। সোহানা থাকছে প্যারিসেই। প্লেনের রিজার্ভেশন ক্যানসেল করে দাও। আমার বিস্তারিত ইন্সট্রাকশন পাঠাচ্ছি আরিফ আখন্দের কাছে, কালেক্ট করে নিয়ো।'

'অলরাইট, স্যার। অ্যান্ড থ্যাংকিউ। ওভার অ্যান্ড আউট।'

ডুক্সেম ব্যুরোর প্রোজেকশন রুম।

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে একটা রীল দেখছে রানা ও ফিলিপ কার্টারেট। পর্দায় দেখা যাচ্ছে একটা বোয়িং সেভেন ও সেভেন ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে গোলাকার সাদা চক্রটার মধ্যে থেমে দাঁড়াল। বেশ কিছুটা দূরে আর একটা বোয়িংকে দেখা যাচ্ছে—আউট অভ ফোকাস। চলন্ত সিঁড়ি দুটো এগিয়ে যাচ্ছে বোয়িং এর দুই দরজার দিকে।

নিচু গলায় ফিলিপ কার্টারেট বললেন, 'এখন শিফল এয়ারপোর্টে যতগুলো প্লেন আসে আর যতগুলো যায়, প্রত্যেকটার ছবি তুলে নেয়া হয় মুভি ক্যামেরায়। গোপনে। সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় যাতে একজন যাত্রীও বাদ না পড়ে। গত বছর পর পর কয়েকটা বোমাবাজি আর হাইজ্যাকের পর নেয়া

হয়েছে এই ব্যবস্থা। এই ছবিটা মাস ছয়েক আগের তোলা। কয়েকটা রহস্যজনক ঘটনা ধরা পড়েছে এই ছবিতে—দেখলেই বুঝতে পারবে। ঘটনাগুলো ঘটে ডান হাতের কব্জিতে প্লাস্টার বাঁধা একজন লোককে কেন্দ্র করে আমার ধারণা, এই লোকটারই খোঁজ জানতে চেয়েছ তুমি আজ আমাদের কাছে। দেখ তো চিনতে পারো কিনা?'

আনমনে ছবি দেখছিল আর কথা শুনছিল রানা। প্লেনে সিঁড়ি লাগানো হয়ে গেছে। প্যাসেঞ্জাররা একে একে নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির মাথায় এবার দেখা দিল ডান হাতে প্লাস্টার বাঁধা লম্বা এক লোক। সোজা হয়ে বসল রানা। কোন সন্দেহ নেই, কবির চৌধুরী। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে পাগল বৈজ্ঞানিক।

'কিন্তু আপনি কি করে জানলেন যে আমি এই লোককেই দেখেছি?' প্রশ্ন করল রানা। 'নিশ্চয়ই আরও কিছু ঘটেছে এখানে? কি সেটা?'

'সে কথায় আসছি আমি একটু পরেই। ছবিটা সম্পূর্ণ দেখে নাও আগে।'

এয়ারপোর্ট বাসে করে প্যাসেঞ্জাররা সব টার্মিনাল বিল্ডিঙে গিয়ে নামল। এগিয়ে যাচ্ছে সবাই ওয়েটিং রুমের দিকে। প্লেন থেকে মালগুলো নামানো হয়ে গেলেই সেগুলো নিয়ে যাওয়া হবে কাস্টম্‌স্ চেকিং হলে। যতক্ষণ মাল নামানো না হয় ততক্ষণ সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে ওই ওয়েটিং রুমে। বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার কবির চৌধুরীকে। ঠিক দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবার সময়ে একটা লোক একটা কাগজের মোড়ক গুঁজে দিল কবির চৌধুরীর হাতে। শেষ হয়ে গেল ফিল্মটা।

'চার্লস্ হিকারী। কুখ্যাত ডায়মন্ড স্মাগলার। আগে থেকেই ইনফর্মেশন এসে গিয়েছিল কাস্টম্‌সের কাছে। জানা ছিল, একটা বিরাট কনসাইনমেন্ট আসছে হিকারীর সাথে। কায়রো থেকে ফলো করা হচ্ছিল ওকে। কিন্তু হাত বদল হওয়ার পর ওই মোড়কটা একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। থরো সার্চ করা হয়েছিল কবির চৌধুরীকে। ও যে বাথরুম ব্যবহার করেছিল সেটাও খুঁজে দেখা হয়েছিল তন্নতন্ন করে, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।'

মন দিয়ে শুনছিল রানা, মৃদু হেসে মন্তব্য করল, 'কবির চৌধুরীর ডান পাটা কাঠের।'

'একটা ধাঁধার উত্তর পাওয়া গেল। এখন বোঝা যাচ্ছে এত খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পাওয়া যায়নি কেন। যাই হোক, যা বলছিলাম, এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার পরেও কিন্তু এই লোকটাকে ফলো করা হয়েছিল। কিন্তু যাকে পাঠানো হয়েছিল সে আর ফিরে আসেনি।'

'খুন?'

'হ্যাঁ। তিরিশ মাইল দক্ষিণে একটা টেলিফোন বুদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল ওকে—মৃত। তারপর থেকে একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কবির চৌধুরী। মাস দুয়েক আগে আমাদেরই এক এজেন্ট স্পট করে ওকে টুলন শহরে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই আমাদের হাতে না থাকায় কিছুই

করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে।'

'প্রমাণ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে কোন এজেন্টকে লাগানো হয়নি?'

'লাগিয়েছিল। অবজার্ভেশনে রাখা হয়েছিল ওকে। ওই রকম একজন রহস্যময় লোক টুলনে কি করছে জানা প্রয়োজন মনে করেছিল ডুক্সেম ব্যুরোর তদানীন্তন চীফ—আমার প্রিয় শিষ্য আর্থার। খুন হয়ে গেছে ছেলেটা নিজের বেডরুমে। কোথাও কোন চিহ্ন বা প্রমাণ রেখে যায়নি হত্যাকারী, একেবারে নিখুঁত।'

'আর টুলনে কবির চৌধুরীর ওপর নজর রাখার জন্যে যাকে পাঠিয়েছিলেন?'

'মাইকেল কলিন। মাছ শিকারীর ছদ্মবেশে পাঠানো হয়েছিল ওকে। তিন দিন আগে খবর এসেছে, হিট-অ্যান্ড-রান অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে কলিন। খুন করা হয়েছে ওকে, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন প্রমাণ নেই কারও বিরুদ্ধে।'

'রিপ্লেসমেন্ট পাঠিয়েছেন?'

'না। এখনও পাঠানো হয়নি কাউকে। বুঝতে পারছি, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে, প্রচণ্ড এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবার ডুক্সেম ব্যুরোকে। কিন্তু এই প্রতিপক্ষের ধরন-ধারণ বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের হাতে কোন তথ্য নেই। কিছু আঁচ করাও সম্ভব হচ্ছে না।'

'আগামীকাল খুব সম্ভব আমার দেশে ফেরা হচ্ছে না—এই কথাটা দিয়ে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন আপনি?'

'এই লোকটার প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আশা করছিলাম, তুমি হয়তো কলিনের রিপ্লেসমেন্ট হতে চাইবে। যদি চাও সে ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে হঠাৎ ভাবছি, সেটা খুব অন্যায় হবে আমার। জেনে শুনে তোমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া অমানুষের কাজ হবে।'

'আমার চীফের আদেশ তো নিজের কানেই শুনেছেন।'

'তা ঠিক। কিন্তু বিপদের পরিমাণ হয়তো জানা নেই ওঁর। হয়তো হাল্কাভাবে নিয়েছেন ব্যাপারটাকে।'

হেসে উঠল রানা। 'কোন কিছুকেই হাল্কাভাবে গ্রহণ করবার লোক মেজর জেনারেল রাহাত খান নন। ভাল করেই জানা আছে তাঁর কবির চৌধুরীর আসল রূপ। আপনারা আর কতটুকু দেখেছেন—বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে পাঁচ-পাঁচবার নামতে হয়েছে ওর বিরুদ্ধে সাংঘাতিক সংঘর্ষে, ধ্বংস করতে হয়েছে একের পর এক ওর ভয়ঙ্কর সব মহা-পরিকল্পনা। আদেশের গুরুত্ব ভালভাবে বুঝে নিয়ে তারপরেই উচ্চারণ করেছেন তিনি কথাগুলো। তিনি চেনেন কবির চৌধুরীকে, জানেন তার বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়ার অর্থ কি।'

'অর্থাৎ, আমি অফার করলেই তুমি কলিনের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে রাজি হবে টুলনে যেতে?'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা। হবে।

'অলরাইট, মাই বয়।' উঠে দাঁড়ালেন ফিলিপ কার্টারেট। 'চলো, তোমাকে আরও কয়েকটা ব্যাপার দেখাব।'

দুই

স্যালন পেরিয়ে সোজা দক্ষিণে ছুটল রানার লাল ল্যান্সিয়া। মার্সেই হয়ে টুলন যাচ্ছে সে 'পিকচার নিউজ' পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে।

একঘণ্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ফিলিপ কার্টারেট। কাগজপত্র, আইডেন্টিটি কার্ড, পেছনের সীটে রাখা পুরানো পোর্টেবল-টাইপ রাইটার, এমন কি সেকেন্ড হ্যান্ড একখানা রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা পর্যন্ত সবই পেয়েছে সে বেনসনের কাছে। ডুক্সেম ব্যুরোরই একজন অপারেটার বেনসন। স্যালনে স্টেশনড। পাঁড় মাতাল লোকটা। সর্বক্ষণ মদ খেয়ে চুর হয়ে রয়েছে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে মোটামুটি একই আকৃতির হওয়ায় বেনসন সাজতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি রানাকে। একটা পাওয়ারলেস চশমা, চুলের জন্যে কিছু ডাই, আর এখানে ওখানে সামান্য কিছু রঙ ব্যবহার করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দরকার পড়েনি তেমন। বেনসনের ওপর কড়া আদেশ হয়েছে, রানার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক পা বেরোতে পারবে না বাড়ি থেকে।

মার্সেই পেছনে ফেলে টুলনের দিকে ছুটল ল্যান্সিয়া। রানার ছদ্মবেশে খুঁত নেই কোথাও, খুঁতটা রয়েছে যার ছদ্মবেশ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে। ইচ্ছে করেই এই বেনসন লোকটাকে বাছাই করা হয়েছে, যদিও ফিলিপ কার্টারেটের ভাল করেই জানা আছে মাতাল বেনসনের আসল পরিচয় এতদিনে সবার জেনে যাওয়ার কথা। ওকে বরখাস্ত করবার সব ব্যবস্থা নেয়া হয়ে গেছে হেড অফিসে। ঠিক এমনি সময়ে, অর্থাৎ চাকরি থেকে বের করে দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ভাঙা কুলোও যেমন কাজে লাগে, তেমনি কাজে লেগে গেছে লোকটা। ওর ছদ্মবেশে রানাকে পাঠানো হচ্ছে টুলনে প্রতিপক্ষকে সজাগ করে দেয়ার জন্যে, আশা করা হচ্ছে সহজ টার্গেট পেয়ে আক্রমণ করবে ওরা।

বেলা বারোটা নাগাদ পৌঁছে গেল রানা টুলন। সী ভিউ হোটেলেই উঠল সে। সৌখিন মাছ শিকারী মাইকেল কলিনও উঠেছিল এই হোটেলেই।

আগে থেকে বুক করা ছিল কামরা। বেল বয়ের পিছু পিছু নিজের ঘরে পৌঁছে মোটা বকশিশ দিল রানা বেল বয়কে। খুশি হয়ে সালাম জানিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। ডাকল রানা, 'শোনো?'

'ইয়েস, মশিয়ে।' ঘুরে দাঁড়াল বেল বয়।

'গত তিন চার দিনের লোকাল নিউজপেপার আমার দরকার। জোগাড় করে আনতে পারবে?'

'নিচে আছে, মশিয়ে। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।' দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

ঘর আর বাথরুম চট করে সার্চ করে নিল রানা। গোপন মাইক্রোফোন পাওয়া গেল না কোথাও। মিনিট তিনেক পর দরজায় নক করে কয়েকটা কাগজ দিয়ে গেল বেল বয়।

কাজ চালানোর মত ফ্রেঞ্চ জানা আছে রানার। মুখে কথার তুবড়ি ছোটাতে কোন অসুবিধে নেই, বরং চেহারার দিকে না চাইলে বুঝবার উপায় নেই যে লোকটা বিদেশী, কিন্তু ফ্রেঞ্চ লেখা পড়তে হলে পদে পদে হোঁচট খেতে হয় ওকে—শর্টহ্যান্ড লেখার অর্থ উদ্ধারের মত। ধৈর্যের অভাব নেই, সময়ও আছে হাতে, কাজেই খুঁজে খুঁজে মাইকেল কলিনের দুর্ঘটনার খবরটা বের করে ফেলল সে। ছোট্ট কয়েক লাইনের খবর। জানা গেল, ভাড়াটে ফিশিং ক্রুজার এস এস সান্তামারিয়ার ক্যাপ্টেন সভার্স ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সবার আগে। সে পৌঁছবার পরপরই নাকি মারা যায় মাইকেল কলিন, কিভাবে কি ঘটেছে বলে যেতে পারেনি মৃত্যুর আগে। এ ব্যাপারে জোর তদন্ত চালাচ্ছে ইন্সপেক্টার এডি মর্গান।

রুম সার্ভিসকে স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা। ঝাড়া আট মিনিট গরম, আর শেষ দু'মিনিট ঠাণ্ডা শাওয়ারে ভিজে লম্বা যাত্রার সব গ্লানি দূর করে দিল সে শরীর থেকে। তাজা একটা ফুরফুরে ভাব নিয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। ততক্ষণে এসে গেছে কফি আর স্যান্ডউইচ। আধ ডজন স্যান্ডউইচ, আর সেই সঙ্গে ছোট ছোট চুমুকে এক কাপ কফি খেয়ে সম্পূর্ণ চাঙ্গা হয়ে উঠল সে। আর এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে দাঁড়াল গিয়ে ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে। সিগারেট ধরাল একটা। তিন মিনিটে ঠিক করে নিল পরবর্তী কর্মপন্থা। কাপটা শেষ করে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে।

সী ভিউ থেকে আধমাইল পুবে জীর্ণ কাঠের জেটির কাছে পৌঁছে ক্যাপ্টেন সভার্সের দেখা পেল রানা। খদ্দের চিনতে দেরি হলো না চতুর ক্যাপ্টেনের, এগিয়ে এল হাসিমুখে।

'ক্রুজার চার্টার করবেন বুঝি? হায়াসের আশেপাশে ভাল শিকার পাওয়া যাচ্ছে এই সময়ে।'

'ওদিকে নয়। সিসি যেতে চাই আমি।'

সিসির নামে একটু যেন চমকে উঠল ক্যাপ্টেন। সতর্ক দৃষ্টিতে রানার মুখটা পরীক্ষা করে নিয়ে বলল, 'মাছ নেই ওদিকে।' ঠোঁটের এককোণ থেকে আরেক কোণে নিয়ে এল সে দাঁত খোঁচাবার খেলালটা হাত দিয়ে স্পর্শ না করেই শুধু জিভের কৌশলে। 'অ্যাকোয়া সিটি তৈরির তোড়জোড়ে সব মাছ ভেগেছে ওই এলাকা ছেড়ে।'

'যাক না,' হাসল রানা। 'আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। অ্যাকোয়া সিটিরই ছবি তুলতে এসেছি আমি। উইকলি পিকচার-নিউজের পক্ষ থেকে।'

এটাই রানার কাভার। পানির নিচে আমেরিকার ডিজনিল্যান্ডের অনুকরণে ইহুদি কোটিপতি মাহমুদ বেগ যে অ্যাকোয়াসিটি তৈরি করছে সে খবর পেয়েছে রানা আগেই, ডুক্রেম ব্যুরোতে প্যারিসে কবির চৌধুরীকে যে গাড়িতে উঠতে দেখা গেছে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থেকে জানা গেছে সে গাড়ির মালিক মাহমুদ বেগ। মাহমুদ বেগের গাড়িতে চড়ে বেড়াচ্ছে কবির চৌধুরী, কাজেই দু'জনের মধ্যে একটা সম্পর্ক যে রয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অ্যাকোয়া সিটি সম্পর্কে ফিলিপ কার্টারেটকে জিজ্ঞেস করে তেমন কিছুই তথ্য জানা যায়নি। প্যারিস মেলায় যদিও একটা স্কেল মডেল ডিসপ্লে করা হয়েছিল, এবং তা নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনারও সৃষ্টি হয়েছিল সবার মধ্যে, কিন্তু সেসব এক বছর আগেকার ব্যাপার। কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে সিসিতে ফটোগ্রাফার বা রিপোর্টারদের প্রবেশ নিষেধ থাকায় ব্যাপারটা পাবলিসিটির অভাবে চাপা পড়ে গেছে। ধন-কুবের মাহমুদ বেগ কন্স্ট্রাকশনের সময় সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে একেবারে ওপেনিং সেরিমনিতে সবাইকে চমক লাগিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী। এই কারণেই খেয়ালী লোকটা সিসির আশেপাশের বিরাট এলাকা কিনে নিয়ে সেটা সাধারণের জন্য আউট অভ বাউন্ডস করে দিয়েছে। কড়া পাহারার ব্যবস্থাও করা হয়েছে সেই সঙ্গে। কাকপক্ষীরও ঢুকবার উপায় নেই।

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন সভার্স। 'না, মশিয়ে। দুঃখিত। ওদিকে যাচ্ছি না আমি। এই তো সেদিন কচ্ছপ ধরতে গিয়ে দুই জেলে নৌকো নিয়ে ঢুকে পড়েছিল ওদের এলাকার মধ্যে। দেখামাত্র গুলি ছুঁড়তে শুরু করে গার্ডরা। নৌকো ফেলে কোনমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে দুজন। সিসির ধারে কাছে যাব না আমি।'

'গুলি ছোঁড়ে…' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'খুব ধুমসে কাজ হচ্ছে বুঝি ওখানে?'

'আল্লাই মালুম!' দুই হাতের তালু ওল্টাল সভার্স। 'লোকজন তো দেখা যায় না।'

'তাই নাকি? শুনেছি দেড়শো ট্রেইন্ড ডাইভার কাজ করছে ওখানে? তারা থাকে কোথায়?'

'ওই এলাকার ভেতরেই। বিরাট এক বাড়ি আছে ওখানে মাহমুদ বেগের, খুব সম্ভব সেই বাড়িতেই থাকে। কেউ কোনদিন ওদের বাইরে আসতে দেখেনি। আমার এক বন্ধু ওখানকার রসদ সাপ্লাই করে। প্রতি সপ্তাহে মালপত্র নিয়ে যায় সে এলাকার সীমানা পর্যন্ত। গার্ড রয়েছে, গার্ডের কাছেই মাল বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসে সে। ওর মুখে শুনেছি, রসদ সাপ্লাই দিতে গিয়ে কোনদিন কন্স্ট্রাকশন ওয়ার্কার চোখে পড়েনি ওর। ওরা ওই এলাকার ভেতরেই কোথাও আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, নইলে অত খাবার খায় কে? কিন্তু দেখা যায় না তাদের।'

'সমুদ্রের নিচে কাজ করলে ওপর থেকে দেখা না যাওয়ারই কথা,' বলল

রানা। 'যাকগে…ছবি তুলতে গিয়ে গুলি খেতে আমিও রাজি না। তবে বোট চার্টার করবার খরচা যখন আমার পকেট থেকে যাচ্ছে না, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দিচ্ছে, তখন কোম্পানীর খরচায় উন্মুক্ত সমুদ্রের কিছুটা নির্মল বায়ু সেবনে দোষ কি? কি বলেন?'

বত্রিশপাটি দাঁত বের করে হাসল ক্যাপ্টেন সন্ডার্স। উঠে পড়ল রানা।

ক্রুজারটা আকারে বাংলাদেশের ছোটখাট একটা লঞ্চের সমান হবে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে হুইল ধরল ক্যাপ্টেন। তীর ঘেঁষে ডানদিকে যাবার নির্দেশ দিল রানা। রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে ক্রুজার থেকে। সমুদ্রের ধার দিয়ে এঁকে বেঁকে বহুদূর চলে গেছে রাস্তাটা, তারপর একসময় বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে ডাঙায়। বহুদূরে সমুদ্রের ধারে বিন্দু বিন্দু বাড়ি দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো। ওইদিকটায় রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্যাপ্টেন বলল, 'ওই দেখা যায় মাহমুদ বেগ সিটি। চার বছর আগে বানিয়েছিল ওটা মাহমুদ বেগ বুড়োদের জন্যে। রিটায়ার করার পর বুড়োদের অবসর জীবন কাটাবার জন্যে আদর্শ। আছে না, ওই আমেরিকায়, ফ্লোরিডা না কি নাম…ওরই অনুকরণে তৈরি হয়েছে ওই সিটি। ওটা পেরিয়ে আরও তিন মাইল গেলে শুরু হবে সিসির সীমানা।'

ছোট ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে। আরও কিছুদূর এগিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওইখানেই তো সৌখিন মাছ শিকারীটা মারা পড়েছিল সেদিন, তাই না?' আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল রানা। আড়চোখে লক্ষ করল, স্টিয়ারিং হুইলটা খামচে ধরে আড়ষ্ট হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন প্রশ্নটা শুনেই। হাসিটা মিলিয়ে গেছে মুখ থেকে। 'কাগজে দেখলাম আপনার চোখের সামনেই নাকি পুরো ঘটনাটা ঘটে?'

সরাসরি না চেয়েও রানা বুঝতে পারল, চঞ্চল হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেন আচমকা এই প্রশ্ন শুনে। কথা বলবার আগে বার দুই ঢোক গিলে নিল।

'ও ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ কেন?' নিচু গলায় জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'আপনিই বা নার্ভাস হয়ে পড়লেন কেন বলুন তো?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'এর মধ্যে রহস্যময় কিছু রয়েছে নাকি আবার?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে সাবধানে মুখ খুলল সন্ডার্স। 'আমি কিছুই দেখিনি। এইদিক দিয়েই জেটিতে ফিরছিলাম সেদিন।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, বুঝতে পারল, অসম্পূর্ণ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি রানা, এখনও অপেক্ষা করছে সে সঠিক উত্তর শুনবার আশায়। বলল, 'হুইলটা একটু ধরুন—মোটর চেক করতে হবে। কোর্সটা বুঝতে পারছেন তো? দুশো পঁচিশে রাখতে হবে।'

নীরবে হাল ধরল রানা। কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা আন্দাজ করে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। বেচারা জানে না, ঝাড়া এক মাইল দূর থেকেও শোনা যায় ওর চিন্তা-ভাবনা পরিষ্কার। ক্যাপ্টেন সন্ডার্সকে ফায়ার এক্সটিংগুইশারের পাশে ঝোলানো ইউটিলিটি নাইফটা খুলে নিয়ে ফেরত

আসা পর্যন্ত সময় দিল সে মনে মনে তিন পর্যন্ত গুনে সাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল পিছন ফিরে

লোকটা যে ঠিক খুন করবার জন্যেই ছুরি তুলেছে তা মনে হলো না রানার, কিন্তু তাই বলে ঝুঁকি নেয়া যায় না ধাঁই করে এক বাংলাদেশী রদ্দা পড়ল ক্যাপ্টেনের কাঁধের ওপর টলে উঠল ক্যাপ্টেন বাঁ হাতে মোটরের সুইচটা অফ করে দিয়েই এক পা এগিয়ে লোকটার পাঁজর বরাবর চালাল রানা লাথি সামলে উঠবার আগেই আরেকটা জুডো চপ পড়ল ক্যাপ্টেনের ঘাড়ে হাত থেকে ছিটকে সশব্দে ছুরিটা পড়ল প্রথমে, তারপর পড়ল ক্যাপ্টেন ডেকের ওপর থেকে ছুরিটা তুলে নিল রানা। বুড়ো আঙুলে ধারটা পরীক্ষা করে নিয়ে চোখা দিকটা ক্যাপ্টেনের গলার ওপর ঠেকিয়ে চাপ দিল একটু যাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো সামান্য চাপেই

বিস্ফারিত হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন সভার্সের চোখ দুটো। ককিয়ে উঠল, 'দাঁড়ান! মারবেন না! যা জানি সব বলছি, জানে মারবেন না! ছুরি সরান।'

ছুরি সরাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না রানার মধ্যে। বলল, 'খবরদার! একটা মিথ্যে কথা বললে পুরো দাবিয়ে দেব।'

গড়গড় করে বলে গেল ক্যাপ্টেন যা যা দেখেছে সব।

'মেয়েটা কে?' ছুরির চাপ আর একটু বাড়াল রানা। 'কি নাম?'

'ট্রিসা।' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ক্যাপ্টেন। 'ওর নাম ট্রিসা। ওর বাবা রিটায়ার্ড প্রফেসর। মাহমুদ বেগ সিটিতে থাকে। প্যাট্রিসিয়া আর কলিন হাবুডুবু খাচ্ছিল প্রেমে পড়ে। সবাই জানে সে কথা। সেদিন সকালে কি নিয়ে ওদের ঝগড়া হয়। সবাই দেখেছে। সবাই জানে এ কাজ ট্রিসা ছাড়া আর কারও হতে পারে না। এর যে কোন বিচার হবে না, সেটাও জানা আছে সবার। ইন্সপেক্টর এডি মরগ্যান চার্জ আনবে না ওর বিরুদ্ধে।'

'কেন?

'ট্রিসার বাবার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তার। মেয়েটাকে সমস্ত গোলমাল থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব রয়েছে এডি মরগ্যানের ওপরেই।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। এবার ফেরা যাক।' ছুরিটা সরিয়ে নিল সে। 'উঠে পড়ুন।'

জেটিতে ফিরে ক্যাপ্টেন সভার্সের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হোটেলের দিকে এগোল রানা, কিন্তু গজ পঞ্চাশেক গিয়ে বাঁক নিয়েই থেমে দাঁড়াল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, দূর থেকে দেখতে পেল হন্তদন্ত হয়ে এইদিকেই আসছে সভার্স। একটা দোকানে ঢুকে সিগারেট কেনার ছলে দেরি করল রানা তিন মিনিট। কোনদিকে না চেয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সভার্স দোকানটা ছাড়িয়ে। ওকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেতে দিয়ে পিছু নিল রানা। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে মাইলখানেক হেঁটে এক জায়গায় থেমে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। একটু এদিক ওদিক চেয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। দ্রুত পা চালাল রানা। সুইট পেরি বার-এর লনে বসে বিয়ার আর স্যান্ডউইচ খাচ্ছে কয়েকজন লোক। একটু

দূরে বসা একজন বিশাল আকৃতির লোকের সঙ্গে নিচু হয়ে ঝুঁকে কথা বলছে ক্যাপ্টেন। ওর সম্পর্কেই যে আলাপ হচ্ছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। ডানদিকের গিফট শপে ঢুকে পড়ল সে। এখান থেকে কাচের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সুইট শেরি বার-এর লনটা পিকচার পোস্ট কার্ডের স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কার্ড ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওদের ওপর নজর রাখল রানা। ক্যাপ্টেনের বক্তব্য শেষ হতেই বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়াল পর্বতপ্রমাণ লোকটা, প্রায় ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল বাইরে দাঁড়ানো একটা গাড়িতে। সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে চলল ক্যাপ্টেন সভার্স।

অন্য খরিদ্দার থাকায় এতক্ষণ রানার দিকে নজর দিতে পারেনি মধ্য বয়সী সেল্‌স-লেডি। এবার এগিয়ে এল রানার কাছে, 'আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি, মশিয়ে?'

'হ্যাঁ। এই পোস্টকার্ডগুলো দেখছিলাম। কিন্তু সিসির কোন কার্ড খুঁজে পাচ্ছি না এর মধ্যে।'

'কিন্তু ওটা তো প্রাইভেট প্রপার্টি। ওই এলাকার পিকচার কার্ড তৈরি করা নিষিদ্ধ। কোথাও পাবেন না।'

'ওখানেই তো অ্যাকোয়া সিটি তৈরি হচ্ছে, তাই না? ডিজনিল্যান্ডের মত এটাও তো পাবলিক প্লেসই হবে শেষ পর্যন্ত। তবে কেন এত ঢাকাঢাকি? পিকচার নিউজের পক্ষ থেকে আমি এসেছি কিছু মেটেরিয়াল জোগাড় করতে, অথচ কোন তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। আপনি তো স্থানীয় বাসিন্দা, বলুন তো কিছু উপায় করা যায় কিনা?'

'উপায় কিছুই নেই, মশিয়ে। স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে আমার পরামর্শ যদি চান, আমি বলব, ও সম্পর্কে কোন তথ্য বের করবার বৃথা চেষ্টা না করাই ভাল হবে। মাহমুদ বেগের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই আপনার। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওর এলাকায় উঁকিঝুঁকি মারা কারও জন্যেই নিরাপদ নয়।'

সদুপদেশ দান করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে গোটা কয়েক পিকচার কার্ড কিনে বেরিয়ে পড়ল রানা। হোটেলের দিকে দশ পা এগিয়ে কি ভেবে আবার ফিরে এল সে দোকানটার সামনে। পেছন ফিরে কথা বলছে মহিলা টেলিফোনে। চাপা, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। বাক্যের একটা টুকরো অংশ কানে যেতেই দোকানে ঢোকার ইচ্ছে বর্জন করে এগিয়ে গেল সে সামনের দিকে। কাকে যেন বলছে মহিলা, '...এইমাত্র বেরিয়ে গেল লোকটা এখান থেকে!'

আশেপাশেই এ দোকান ও দোকানে ঘোরাফেরা করল রানা বেশ কিছুক্ষণ, যেন আপন মনে শো কেসের সাজানো জিনিসগুলো দেখছে। হঠাৎ ঘাড়ের পেছনে কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো ওর। রাস্তাঘাটে অনেক লোক। সবার ওপরেই আলতোভাবে একবার চোখ বুলাল রানা। বেশ ভিড়,

কিন্তু ভিড়ের মধ্যেও ওর অভ্যস্ত চোখ খুঁজে বের করে ফেলল লোকটাকে
অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে

তিন

সন্ধ্যায় ফ্লেমিঙ্গো রয়্যালে ঢুকল রানা। মাঝারি মানের বার। তাকে দেখেই বারটেন্ডার যেভাবে পরিচিতের মত হেসে পুরো এক গ্লাস জিন আর সেই সঙ্গে এ্যাঙ্গোসচুরা বিটার লেমনের বোতল এগিয়ে দিল তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল আসল বেনসনের পদধূলি এখানে আগেই পড়েছে। রীতিমত পরিচিত লোক সে এখানে।

বারটেন্ডারকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিনের গ্লাস আর লেমনের বোতলটা নিজের দিকে টেনে নিল রানা।

'কি খবর? কেমন চলছে আপনার?' পাশের টুলে বসা মোটাসোটা এক লোক প্রশ্ন করল জড়িয়ে জড়িয়ে। কাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে বুঝতে না পেরে এপাশ ওপাশ চাইল রানা। ঢুলু ঢুলু চোখ তুলে রানার মুখের দিকে চাইল লোকটা। 'সেদিন যেন কার খোঁজ করছিলেন? তার দেখা পেয়েছিলেন?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে খোলা দরজার দিকে মন দিল রানা। সোজাসুজি ভিতরের দিকে না চেয়ে দরজার বাইরে থেকে আড়চোখে এইদিকেই নজর রেখেছে লোকটা। সেই যে লেগেছে, এখন পর্যন্ত পিছু ছাড়েনি লোকটা রানার।

'আপনি কি সী ভিউতেই উঠেছেন?' জোর করে আলাপ জমাবেই মোটা লোকটা। বলল, 'আমি কিন্তু উঠিনি এবার। ব্যাটারা এক প্যাকেট তাস আনতে বললে টিপসের লোভে বাহান্ন বারে বাহান্নটা তাস আনবে। ইনটলারেবল্!'

সত্যিই ইনটলারেবল্! ড্রিংক নিয়ে জানালার ধারের টুলটায় গিয়ে বসল রানা। মাতালটার পাশে থাকলে কথা থামবে না ওর। খোলা দরজা দিয়ে লক্ষ করল দুইহাত জড়ো করে বাতাস বাঁচিয়ে সিগারেট ধরাল লোকটা, তারপর একবার এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে চলে গেল শহরের দিকে।

কয়েক মিনিট পরেই সুপারচার্জড ইঞ্জিনের গর্জনে মুখ তুলে চাইল রানা দরজার দিকে। সাদা, টু-সিটার রেসিংকারটা ক্যাঁচ শব্দ তুলে থামল ফ্লেমিঙ্গো রয়ালের সামনে। সেই গাড়ি! ড্রাইভিং সীটে সেই মেয়েটা! পাশে বসা টাক-মাথা এক লোক। গতকাল প্যারিসে পাশের ওই সীটে কবির চৌধুরীকে উঠে বসতে দেখেছিল রানা। গতকাল লক্ষ করেনি, কিন্তু আজ খেয়াল করল গাড়িটার বাম্পার আর গ্রিল মেরামত করা হয়েছে দু'একদিনের মধ্যেই—বেশি তাড়াহুড়ো করায় অসমান রয়ে গেছে এখানে ওখানে। গাড়ি থেকে নেমে

সোজা এসে বারে ঢুকল মেয়েটা। লো নেকলাইনের কালো ড্রেস, কালোর উপর ঝকঝক করছে একটা ডায়মন্ড ব্রোচ। মেয়েটার পিছু পিছু হাসিমুখে বারে ঢুকল টেকো লোকটা।

'হ্যালো, ট্রিসা তোমার রোজকার পশ্ বার ''ডি রিগাল'' ফেলে এখানে কি মনে করে?' বাঁকা হাসি হাসল মাতাল লোকটা। 'তোমাকেও ঠকিয়েছে বুঝি?'

'হ্যালো, স্যাম।' আন্তরিকতার সাথে হাসল ট্রিসা। সাথের টেকো লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'জিমি ফিশিং নিয়ে আলাপ করতে চায় ওর বন্ধুদের সাথে, আর আমি চাই নাচতে যেতে। দুজনে আপোস নিষ্পত্তি করে এখানে এসেছি।' মাছ শিকারীদের টেবিলটায় গিয়ে বসল ওরা দুজন।

মাতালটার বকবকানির ঠেলায় দূরে জানালার ধারে পালিয়েছিল রানা। এবার সে এগিয়ে গেল আলাপ জমাতে। বেনসনের সঙ্গে মাতালটার পরিচয় আগেই হয়েছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু যতদূর মনে হয় মেয়েটার সাথে ওর পরিচয় হয়নি—হলে কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যেত। বারটেন্ডারকে দুটো ড্রিংকের অর্ডার দিয়ে কথা পাড়ল রানা, 'বার ডি রিগালে যান না আর?'

'আর বলবেন না। চোর সব। রেগুলার যেতাম ওখানে। একদিন আমাকে মাতাল মনে করে ড্রিংকের সঙ্গে পানি মিশিয়ে সার্ভ করে বসল। তুমুল ঝগড়া। তারপর থেকে বন্ধ করে দিলাম ওখানে যাওয়া। আচ্ছা, আপনিই বলুন—'

'আকর্ষণীয় মেয়েটা,' ভুরু নাচিয়ে ট্রিসার দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'আপনাদের অনেক দিনের পরিচয় বুঝি?'

'ওই বার ডি রিগালেই দেখা হত রোজ। আলাপ করবেন নাকি? দেব পরিচয় করিয়ে?'

'তাহলে তো চমৎকার হয়। অবশ্য আপনার যদি কোন অসুবিধে না থাকে।'

হৈ হৈ করে উঠল মোটা লোকটা। 'আরে, এ আর এমন কি কথা…আসুন, এক্ষুণি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের।' উঠে দাঁড়াল স্যাম। রানার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কোণের টেবিলে। রানাকে এগোতে দেখে খুশি খুশি মনে হলো ট্রিসার চোখমুখ। উজ্জ্বল চোখে চাইল। 'পরিচয় করে দিচ্ছি,' যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সঙ্গে শুরু করল মাতাল, 'ইনি হচ্ছেন আমার বহু পুরানো বিশিষ্ট বন্ধু মিস্টার—' এই পর্যন্ত এসে হঠাৎ তার খেয়াল হলো রানার নামটা তার জানা নেই। মাতাল স্যামকে কে না চেনে, রানার নামটা স্মরণ করবার চেষ্টায় মাথা চুলকাতে দেখে হো হো করে হেসে ফেলল সবাই। এবং হাসবার সুযোগ পেয়ে সহজ হয়ে গেল পরিচয় পর্বের আড়ষ্টতা। নিজেকে চার্লস বেনসন বলে পরিচয় দিল রানা।

টেকো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিল, 'আমি ডক্টর জিমি ক্রিদারো। সাইজ দেখে নিশ্চই বুঝতে পারছেন আমি সেই বিখ্যাত ব্রিটিশ কমেডিয়ান

বামন ক্রিদারো নই?' আবার একচোট হাসল সবাই। তারপর সে প্যাট্রিসিয়া আর তার মৎস্য শিকারী দুই বন্ধুর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিল। রানার কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দ্বিতীয়বার টুলনে কি মনে করে?'

ধ্বক করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। তবে কি বেনসন তাকে জিমি ক্রিদারোর সঙ্গে আলাপের কথা বলতে ভুলে গেল? নাকি সে এমনই মাতাল অবস্থায় ছিল যে নিজেই জানে না জিমির সঙ্গে পরিচয়ের কথা?

'আমার ম্যাগাজিন একটা ফিচার করতে চায় অ্যাকোয়াসিটির ওপর।' সাবধানে বলল রানা।

'কলিন আর তার ফিশিং অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে কি একটা লিখছিলেন সেটা কি শেষ হয়েছে?'

'নাহ্ কলিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওটারও ইতি হয়ে গেছে।'

ট্রিসা হঠাৎ উঠে জুকবক্সের দিকে চলে গেল।

গলা নিচু করে জিমি বলল, 'ট্রিসার সাথে ভাব হয়ে গিয়েছিল কলিনের। ও মারা যাওয়ার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে মেয়েটা।' এইসব কথাবার্তায় রানাকে অপ্রস্তুত হতে দেখে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার অপ্রস্তুত হবার কিছুই নেই, মিস্টার বেনসন। আলাপ আগেই হয়েছিল আমাদের। কিন্তু সে রাতে এত ড্রিংক করেছিলেন যে শুধু আমার কথা কেন, কোন কথাই আপনার মনে থাকবার কথা নয়।'

'রানা।' ট্রিসার গলা শোনা গেল। চোখ তুলে তাকাতেই ট্রিসা হাতছানি দিয়ে ডাকল রানাকে জুকবক্সের কাছে। এক ডাকেই হিম হয়ে গেছে রানার কলজেটা। এক চুমুকে বেশ অনেকটা জিন গিলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। চিন্তার ঝড় উঠে গেছে মাথার ভিতর। তবে কি প্যারিসে চিনে ফেলেছিল ওকে কবির চৌধুরী? সে-ই কি পাঠিয়েছে ট্রিসাকে এই বারে? বেনসনের ছদ্মবেশ ভেদ করে ওর আসল পরিচয় জেনে গেছে ওরা? কি করে জানল ট্রিসা ওর আসল নাম? নাকি আন্দাজে ছুঁড়ছে ঢিল? নানান প্রশ্ন ঠেলে আসতে চাইছে, কিন্তু মুখটা নির্বিকার রেখে এগিয়ে গেল সে। কাছে যেতেই মিষ্টি লজ্জিত হাসি হাসল ট্রিসা। 'চেঞ্জ মোটেও নেই আমার কাছে। ২৯-এ গানটা একটু বাজিয়ে শোনাবেন?'

কয়েন ঢুকিয়ে ২৯-এ টিপে দিয়ে গানের কথাগুলো পড়ল রানা।

ওতে লেখা

রানা রানা রানা, রানা রানা রানা,
লালা লালা লালা, লালা ডুবিডু।।

ইটালিয়ান জেলেদের গান একটা। ট্র্যাডিশনাল জ্যাজ। ব্যাপারটা কি ঘটনাচক্রের মিল, নাকি ইচ্ছে করে জেনেশুনেই তাকে খোঁচা দিয়ে ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে? একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়ার কোন উপায় নেই।

গানটা আরম্ভ হয়ে গেছে। চোখ বুজে তালে তালে কয়েক সেকেন্ড শরীর দোলাল ট্রিসা, তারপর জিজ্ঞাসু চোখ রাখল রানার চোখে, 'আসুন না, নাচি?

পারেন?' রানা মৃদু হাসতেই বাড়িয়ে দিল হাত। নাচে যোগ দিল রানা। দু'মিনিট নেচেই অবাক হয়ে গেল ট্রিসা। 'দারুণ নাচতে পারেন তো আপনি!'

জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল রানা আবার।

'কিন্তু এই ঘুপচির মধ্যে সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করছেন কেন?' এবার আরও একটু সরাসরি ট্রিসার প্রশ্ন।

'একা একা এখানেও যা অন্যখানেও তাই,' বলল রানা। 'সুন্দরী সাথী কই যে জমবে সুন্দর সন্ধ্যা?'

'সত্যি? আমিও সাথী পাচ্ছিলাম না বলে টেকো জিমির সাথে নষ্ট করছিলাম সন্ধ্যাটা। মাছ আমার দুচোখের বিষ, অথচ মাছ ছাড়া আর কিছু বোঝেই না ও। সব সময় শুধু ফিশিঙের চিন্তা।'

শেষ হয়ে গেল গান।

রানার হাত ধরে জিমির উদ্দেশে বলল ট্রিসা, 'আমরা বার ডি রিগালে চললাম। তুমি আসবে?'

গভীর আলাপে মত্ত ছিল জিমি তার দুই বন্ধু আর সেই মাতালটার সাথে, আঙুল তুলে কি যেন বোঝাচ্ছিল ওদের। সেই অবস্থাতেই বক্তব্যের মাঝপথে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ট্রিসার গলা শুনে। বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা যাও। আমি আসছি যত শীঘ্রি পারি, তবে আমার অপেক্ষায় না থাকাই ভাল শুভ ইভনিং।'

তিন মিনিটের পথ বার ডি রিগাল। গাড়ি নিল না ওরা, রওনা হলো হেঁটেই। চলতে চলতে লক্ষ করল রানা এখন আর কেউ অনুসরণ করছে না ওকে। কারণ কি? আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণের লোক জুটে গেছে বলে?

বার ডি রিগালে ঢুকবার পথটা ঝিনুক আর নানান ধরনের শেল দিয়ে সুন্দর করে বাঁধানো। সোজা নাচের ঘরে গিয়ে বসল ওরা। মাঝারি আকারের হলঘর। মাঝখানটা নাচবার জন্যে ফাঁকা রেখে চারপাশ দিয়ে পাতা রয়েছে টেবিল চেয়ার। দু'জনের জন্যেই ভোদকা-মার্টিনির অর্ডার দিল রানা।

বার ডি রিগালের নিজস্ব ব্যান্ড বাজাচ্ছে 'দ্য ওয়ে ইউ লুক টু নাইট'। উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলুন, একটু নেচে আসা যাক।'

নাচতে গিয়ে ট্রিসার শরীরের আশ্চর্য ছন্দময় বাঁক লক্ষ না করে পারল না রানা। আগের চেয়ে অনেক সহজ ভাবে নাচছে ওরা এখন, অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে। ছোঁয়া লেগে যাচ্ছে শরীরের এখানে ওখানে—বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছে রানার সর্বশরীরে, গরম হয়ে উঠতে চাইছে রক্ত। নিজেকে সাবধান করল রানা, এই শরীরের টানেই প্রাণ দিয়েছে কলিন, সতর্ক না থাকলে একই পরিণতি ঘটবে তোমারও।

বদলে গেল বাজনার ছন্দ। হাসিমুখে রানার চোখে চোখ রাখল ট্রিসা। 'এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা!'

'কোনটা?' জানতে চাইল রানা।

'তোমার সাথে নাচা। এত ভাল লাগছে, বেনসন, মনে হচ্ছে সারারাত

নাচলেও সাধ মিটবে না। বহুদিন এত ভাল পার্টনার পাইনি।'

'শুধু নেচেই শেষ করে দেবে রাতটা?'

চট করে রানার চোখের দিকে চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হলো ট্রিসা। রানার বাঁহাতের আলতো আদরে আবেশে বুজে আসতে চাইল ওর চোখ। রানার বুকে মাথা রেখে নিচু গলায় বলল, 'একটা বীচ আছে এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে। কেউ যায় না ওদিকে। একেবারে নির্জন। ঠিক একঘণ্টা পর তোমার সাথে দেখা করব আমি ওই বীচে।' ফিসফিসে গলায় কানে কানে চিনিয়ে দিল সে বীচটা রানাকে।

ভিতর ভিতর হোঁচট খেল রানা। ঠিক ওই জায়গায় কলিনও অপেক্ষা করেছিল ট্রিসার জন্যে। সেই একই জায়গায় ডাকছে এবার ও রানাকে। চট করে মনে পড়ে গেল সাদা কনভার্টিবলের দোমড়ানো বাম্পারের কথা। কিন্তু ব্যাপারটার শেষ দেখতে হবে ওর। এই সূত্র ছেড়ে দিলে পিছিয়ে যাবে ও অনেকখানি। কাজেই সম্মতি জানাল সে একটা চোখ টিপে। ঠিক হলো, রানা নিজের গাড়ি নিয়ে যাবে। অপেক্ষা করবে ট্রিসার জন্যে। ট্রিসা ফিরে যাবে ফ্লেমিঙ্গো রয়ালে। ওখানে জিমিকে মাথা ধরেছে বলে বাড়ি ফেরার নাম করে বীচে গিয়ে দেখা করবে রানার সাথে।

ড্রিংক শেষ করে বেরিয়ে পড়ল রানা। চাঁদ উঠেছে আকাশে। এলোমেলো মাতাল হাওয়া আসছে সাগর থেকে। বিপজ্জনক প্রেমের রাত আজ।

ব্রিজটার কাছেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ল্যান্সিয়াটা পার্ক করেছে সে আরও সিকি মাইল দূরে এমন এক জায়গায় যাতে সহজে কারও চোখে না পড়ে। ঘড়ি দেখল। প্রায় আধঘণ্টা আগে পৌঁছেছে সে ব্রিজটার কাছে। বারবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইছে চারপাশে। কেউ নেই। অথচ কেন যেন মনে হচ্ছে ওর অলক্ষ্যে কেউ নজর রাখছে ওর ওপর। বার ডি রিগাল থেকে বেরিয়ে ফ্লেমিঙ্গো রয়ালের সামনে আসবার পর থেকেই এই অনুভূতিটা আবার পেয়ে বসেছে ওকে। কিন্তু অনুসরণকারীকে খুঁজে বের করতে পারেনি সে কিছুতেই। গাড়িতে উঠবার আগে ভালমত পরীক্ষা করে দেখেছে সে কেউ কিছু ফিট করে রেখেছে কিনা, বীচে আসবার পথে দু'দুবার থেমেছে সে, অপেক্ষা করেছে বাতি ও ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে। রিয়ার ভিউ মিররে দেখা যায়নি কিছুই, কোন গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দও আসেনি কানে। এত সাবধানতার পরও মন থেকে দূর করতে পারছে না সে অস্বস্তিটা। কিছু একটা গোলমাল নিশ্চয়ই রয়েছে কোথাও।

ট্রিসার আকস্মিক আমন্ত্রণ কিছুতেই স্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে না। জুকবক্সের সামনে হঠাৎ 'রানা' বলে ডেকে ওঠার পেছনেও হয়তো স্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য রয়েছে ওর। বেনসনের ছদ্মবেশ যদি ওরা ভেদ করতে না-ও

পারে তবু খোঁজখবর নিতে দেখে রানার উদ্দেশ্য কিছুটা অন্তত আঁচ করে নিয়েছে ওরা। আজকের এই আমন্ত্রণ কি আরও খবর জানার জন্যে? নাকি ফাঁদ? যদি তাই হয়, কি ফাঁদ পাতা হয়েছে ওর জন্যে এই নির্জন সাগর তীরে?

হঠাৎ দূরে সুপারচার্জড রেসিং কারের শব্দ পেল রানা। লক্ষ্য রাখল দূরের হেডলাইটের দিকে। একটাই গাড়ি আসছে—কেউ ফলো করছে না ট্রিসাকে। অর্থাৎ, আপাতত আক্রমণের উদ্দেশ্য নেই ওদের, এটা ধরে নেয়া যায়?

রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল রানা। ছুটে আসছে গাড়িটা ওর দিকে। হাত নাড়াল রানা, তারপর হাসিমুখে এগোল সামনের দিকে। কিন্তু মেয়েটা গতি কমাচ্ছে না কেন গাড়ির? চেষ্টা করে হাসিটা ধরে রাখল সে। এদিকে প্রতিটা পেশী টানটান হয়ে রয়েছে, দরকার হলে শেষ মুহূর্তে যেন লাফিয়ে ডিগবাজি খেয়ে সরে যেতে পারে গাড়ির সামনে থেকে। দরকার হলো না। চ্যাক করে টায়ারের শব্দ তুলে কয়েক গজ স্কিড করে থেমে দাঁড়াল গাড়িটা। রানার তিনহাত সামনে।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ট্রিসা গাড়ি থেকে।

'এত জোরে গাড়ি চালিয়ে ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলে একেবারে। এমন বেপরোয়া চালালে দেখ আবার অ্যাক্সিডেন্ট না করে বসো কোনদিন।'

উঁচু গলায় হেসে উঠল ট্রিসা। 'মিছে কথা বোলো না মোটেও ভয় পাওনি তুমি। আমি লক্ষ করেছি, মুখের হাসিটা পর্যন্ত মলিন হয়নি তোমার একটুও।' গাড়ির প্যাসেঞ্জার সীটে রাখা ক্যারিয়ার ব্যাগটা হাতে তুলে নিল সে, অপর হাতে রানার বাহু জড়িয়ে ধরে টানল বড় পাথরটার দিকে কিছুক্ষণ আগেও এখানে পানি ছিল—ভাটায় সরে গেছে। মসৃণ বালি থেকে ভেজা ভেজা ভাবটা যায়নি এখনও। ক্যারিয়ার ব্যাগ থেকে কম্বল বের করে রাস্তাটাকে আড়াল করে বিছাল ট্রিসা পাথরের পেছনে। স্যান্ডেল দুটো লাথি মারার ভঙ্গিতে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। রানার দিকে ঘাড় কাত করে চেয়ে মিষ্টি হাসল। 'কি ব্যাপার, সাঁতার জানো না?'

ডান হাতে জিপারটা টেনে নামিয়ে শোল্ডার স্ট্র্যাপদুটো কাঁধ থেকে সরিয়ে দিতেই ঝুপ করে গোল হয়ে পড়ল জামাটা পায়ের কাছে। ট্রিসার পরনে কালো বিকিনি। চাঁদের আলোয় অপরূপ লাগছে ওর দেহের বাঁক।

কোটের বোতাম খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। খিলখিল হেসে সাগরে নেমে গেল ট্রিসা। এই মুহূর্তে ভাবাই যায় না তিন দিন আগে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে মেয়েটা তার প্রেমিককে। কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে বলে মনে হলো ওর। পরমুহূর্তে মনে মনে কান চেপে ধরল নিজের—ব্যাটা, বিটলেমী হচ্ছে? কবির চৌধুরীর সাথে দেখনি তুমি ওকে কাল? তোমার সামনে আধ ন্যাংটো শরীর দেখলেই সাত খুন মাফ হয়ে যেতে পারে না ওর। ভাল চাও তো তোবড়ানো বাম্পারটার কথা খেয়াল রেখো।

দশমিনিট জলকেলির পর ধীরে ধীরে উঠে এল ওরা সাগর থেকে। পায়ে পায়ে এগোল পাথরের পেছনে বিছানো কম্বলের দিকে।

আরও দশমিনিট পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা হাত রাখল ট্রিসা পাশে শোয়া রানার বুকে। আলতো ভাবে বিলি কাটছে রানার লোমশ বুকে।

'ট্রিসা।'

'উঁ।' কনুইয়ে ভর দিয়ে পাশ ফিরল ট্রিসা। মাথা রাখল হাতের তালুর ওপর।

'তোমার কথা বলো।'

'বলার মত তেমন কিছুই নেই। আজকের সন্ধ্যেটা ছাড়া আমার জীবন একেবারেই ঘটনাবিরল নীরস।'

'সবারই বোধহয় কোন না কোন সময়ে জীবন সম্বন্ধে এই রকম ধারণা জন্মে।'

'এটা ক্ষণিকের ধারণা নয়, চার্লস্। তুমি নিশ্চয়ই গভমেন্ট প্রজেক্টে কোন কাজ করোনি কোনদিন। তাহলে কিছুটা আন্দাজ করতে পারতে আমি কেন একথা বলছি।'

'গভমেন্ট প্রজেক্টে কাজ করো বুঝি তুমি? কি প্রজেক্ট?'

'ওটা গোপন ব্যাপার, চার্লস্। এটুকু বলতে পারি যে আমি ইলেকট্রোনিক্স-এর ওপর কাজ করছি। এক একবারে অনেক দিনের জন্যে আটক থাকতে হয় ওই একঘেয়ে কাজে। যখন আর পারি না তখন ওরা আমায় এখানে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয় কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে। তারপর আবার ছ'মাসের জন্যে ঢুকতে হবে আমাকে সেই একঘেয়ে কয়েদখানায়।' কথা বলতে বলতে রানার কনুইয়ের একটু ওপরে ছোটকালে দেওয়া প্রথম টিকার দাগটার ওপর হাত বুলাচ্ছিল ট্রিসা। রানার হাতটা আদর করে একটু টিপে দিয়ে বলল, 'কিন্তু আজ রাতের পর তো আরও অসহ্য ঠেকবে আমার—কি করে সহ্য করব ভাবছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্রিসা।

'মেয়েরা তো সাধারণত ইলেকট্রোনিক্স-এর মত কঠিন লাইনে যায় না—সুন্দরী মেয়েরা তো নয়ই। তুমি এর মধ্যে ঢুকলে কেমন করে?'

'আমার বাবার মুখ চেয়েই ঢুকেছিলাম এই লাইনে। ভাই নেই বলে ছেলের জায়গা আমাকেই পূরণ করতে হয়েছে।'

'তোমার পুরো নাম প্যাট্রিসিয়া ব্র্যাড না?' হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা রানার কাছে। 'প্রফেসর আর্থার ব্র্যাড তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ, তুমি তাঁর নাম জানো দেখছি?'

'এটমিক সাবমেরিনের আবিষ্কর্তা প্রফেসর আর্থার ব্র্যাড-এর নাম কে না জানে?'

'সে অবশ্য অনেকদিন আগের কথা—এখন উনি রিটায়ার করে ওই মাহমুদ বেগ সিটিতে বসবাস করছেন।' আঙুল দিয়ে দূরের বাড়িগুলোর দিকে দেখাল

ট্রিসা।

এক ঝাপটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে দু'জনের দেহে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। এতক্ষণ টের পায়নি—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে ফেরা দরকার—এখানে বেশিক্ষণ থাকলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।' বলল ট্রিসা।

'আচ্ছা, জিমির সাথে তোমার কি রকম সম্পর্ক?' ট্রিসার সম্বন্ধে সব না জেনে উঠতে চায় না রানা।

মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে ফেটে পড়ল ট্রিসা। 'বাবার ডাক্তার জিমি। তিনমাস আগে বাবার একটা স্ট্রোক হয়েছিল, তারপর থেকেই···'

কথা শেষ হলো না ট্রিসার, ঝট করে গড়িয়ে সরে গেল রানা। চিৎকার করে উঠল ট্রিসা। স্টিল টিপ বুট সুদ্ধ একটা পা প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ল রানার মাথাটা যেখান থেকে সরে গেল ঠিক সেই জায়গায়। শুয়ে থেকেই পা চালাল রানা লোকটার বুক বরাবর। অতর্কিত আঘাতে এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। সেই সুযোগে উঠে দাঁড়াল রানা—হাত দুটো একত্র করে মিড্ অনে বাউন্ডারি মারার ভঙ্গিতে মারল লোকটার সোলার প্লেক্সাসে। আশ্চর্যজনক ভাবে হজম করল লোকটা ওই প্রচণ্ড মার। এক পা পিছিয়েই পা চালাল রানার তলপেট লক্ষ্য করে। সাঁৎ করে একপাশে সরে পায়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া পা'টা দু'হাতে ধরে সজোরে ঠেলে দিল রানা ওপর দিকে। দড়াম করে পাথরটার সঙ্গে ঠুকে গেল লোকটার মাথা। ঝপাৎ করে পড়ল নিচে। জ্ঞান হারায়নি লোকটা এখনও। ডান হাত পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে সে। এক লাফে এগিয়ে ধরে ফেলল রানা লোকটার রিভলভার সুদ্ধ হাত। ধরেই শরীরের সব শক্তি দিয়ে মোচড় দিল নির্দয় ভাবে। কড়াৎ করে হাড় ফুটল কাঁধের—চিৎকার করে উঠল লোকটা।

'গাড়ির দিকে দৌড়াও, ট্রিসা।' ট্রিসার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই রানা দেখতে পেল তিনশো পঞ্চাশ পাউন্ডের একটা পাহাড় ছুটে আসছে ওর দিকে। ইন্সপেক্টার এডি মরগ্যান! পেট বরাবর একটা ঘুসিই মরগ্যানের জন্যে যথেষ্ট হবে। মোটু ইন্সপেক্টার দম ফিরে পেতে পেতেই রানা পগার পার হয়ে যাবে গাড়ি নিয়ে। বাঁ পা সামনে বাড়িয়ে বিরাশি সিক্কা ঘুসি চালাল রানা ওর পেট লক্ষ্য করে। রানাকে অবাক করে দিয়ে চট্ করে থেমে গেল মরগ্যান ওই বিরাট শরীর নিয়ে। পা দুটো দু'পাশে সরে গেল। রানার ঘুসিটা ওর গায়ে লাগবার আগেই ওর হাতটা ঘুরে এসে বাড়ি মারল রানার হাতে। এই ভঙ্গি রানার অপরিচিত নয়—জাপানের ক্লাসিক সুমো। নিচু মার প্রতিহত করবার জন্যে প্যারি ডিফেন্স। দূর থেকে যাকে নরম মাংসপিণ্ড বলে মনে হয়েছিল তার হাত যে স্টীলের মত শক্ত হতে পারে কল্পনাও করেনি রানা—হাড়ে হাড়ে টের পেল। রানার হাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই ডান হাতটা ভাঁজ

করে থুতনিতে মারল লোকটা খোলা তালু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে। সেই সাথে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল মুখ দিয়ে। বিজয় ধ্বনি। সুমো কুস্তিতে ইয়োকোযুমা বা গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ান এই রকম আওয়াজ করে। প্রথম চোটে অবাক হলেও উল্টো মার মারতে পারত রানা—কিন্তু তাতে মরগ্যানের নির্ঘাত মৃত্যু হত। পুলিসের লোক মেরে খুনের দায়ে পড়তে চায় না রানা। পেছনে সরে মারটা এড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পুরোপুরি এড়াতে পারল না সে। রানার শরীরটা মাটি ছেড়ে দুই ইঞ্চি শূন্যে উঠে গেল। পেছনে সরে মারটা হালকা করে না নিলে ওই মারেই ঘাড়টা মটকে যেত ওর। রানার দেহ মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের চপ পড়ল ওর কণ্ঠার ওপর। ডেথ ব্লো! মাথার ভিতরে বোমা ফাটল রানার। যখন সুযোগ ছিল তখন এডি মরগ্যানকে মেরে না ফেলার জন্যে মরার আগে নিজেকেই গাল দিল রানা—শুয়োর!

চার

'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি শালাকে! সবসুদ্ধ কেটেই ফেলব আমি।'

তাহলে মরেনি রানা! কথাগুলো কানে গেলেও প্রথমে মানে বুঝতে পারল না সে। নগ্ন দেহে ঠাণ্ডা ধাতব ছোঁয়া পেতেই চোখ খুলল। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখল একটা বড় ছুরি নিয়ে তার পুরুষাঙ্গ কাটার যোগাড় করছে লোকটা। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এডি মরগ্যান ট্রিসার পাশে। সমস্ত মনোবল একত্র করে ঘুসি চালাল রানা। ঘুসিতে জোর হলো না মোটেও। অতি সহজেই হাত দিয়ে ঘুসিটা প্রতিহত করে তার বুকে চেপে বসল লোকটা। দাঁত বের করে হিংস্র হাসি হাসল রানার অসহায় অবস্থা দেখে। চেহারা দেখে বোঝা যায় সুযোগ পেলে দাঁত দিয়ে কামড়ে টুকরো টুকরো করবে সে রানাকে।

'ফ্রান্সেসকো!' চাবুকের মত শোনাল এডির গলা। 'মিছে সময় নষ্ট হচ্ছে। সময় নেই এখন। তুমি মেয়েটাকে বাসায় পৌঁছে দাও ওর গাড়িতে করে। তোমাকে পরে তুলে নেব আমি।'

'নিজের চোখেই তো দেখলেন এই হারামি কি করেছে মেয়েটাকে।' মৃদু আপত্তি জানাল ফ্রান্সেসকো।

রানার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে এডি। 'ওর চেয়ে ট্রিসারই তো আগ্রহ বেশি ছিল বলে মনে হলো আমার।' হাত বাড়িয়ে ছুরিটা ফ্রান্সেসকোর হাত থেকে নিয়ে নিল এডি।

এরা লুকিয়ে পুরো ব্যাপারটাই দেখেছে। কিন্তু আগে থেকে ওরা কি

করে জানল যে রানারা এইখানেই আসবে? নিশ্চয়ই ট্রিসা নিজেই খবর দিয়েছে ওদের। যে বারে কোনদিন যায়নি ট্রিসা, হঠাৎ সেই বারে যাওয়া—রানাকে ভজিয়ে ভাজিয়ে বীচে নিয়ে আসা—ট্রিসার গাড়িতে ক্যারিয়ার ব্যাগে কম্বল, তোয়ালে, ইত্যাদি রেডি থাকা সব কিছুর মানেই পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। রানাকে নির্জনে একা পাওয়াই ছিল ওদের লক্ষ্য। কিন্তু কেন? ইন্টারোগেশন?

'জামাকাপড়গুলো চটপট পরে ফেলো, বাছা।' এডি মরগ্যান তাগাদা দিল রানাকে।

হাত পা চালাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে রানার। শরীরটা আগের চেয়ে চারগুণ ভারী ঠেকছে। কৈফিয়তের সুরে বলল, 'মেয়ের ওপর একটু নজর রাখার জন্যে মেয়ের বাবা আমায় মাসে মাসে কিছু দেয়। নিজে হুইল চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারে না বলে এদিক ওদিক বিশেষ যেতে পারে না বেচারা। আর মেয়েটাও হয়েছে একেবারে বন্য প্রকৃতির। অবশ্য ওর কোন চালাকিই আর আমার অজানা নেই—যেমন জানি, কোন মোটেল-রূম ব্যবহার না করে ও এই বীচেই আসবে।'

মিছে কথা, ভাবল রানা। মুখে বলল, 'দৃশ্যটা লুকিয়ে পুরোপুরি উপভোগ করে নিয়ে তারপর মেয়েটাকে সামলাও বুঝি?'

'তুমি হলে কি করতে? দেখতে না?' হাসল এডি।

রানা কাপড় পরে তৈরি হতেই এগিয়ে এসে তার বগলের কাছে হাত ধরে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল এডি মরগ্যান। স্লো মোশন মুভির মত হাত পা চলছে রানার। দূরে দেখা যাচ্ছে ট্রিসা গাড়িতে উঠে বসেছে—ফ্রান্সেসকোর ডান হাতটা অকেজো হয়ে ঝুলছে। বাঁ হাত দিয়ে দরজা খুলে পাশের সীটে উঠে বসল সে। গর্জন তুলে ছুটে গেল গাড়িটা মাহমুদ বেগ সিটির দিকে।

'চলো, এগোও রিপোর্টার সাহেব।' হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল এডি রানাকে। একেবারে কাছাকাছি পৌঁছবার পর লুকিয়ে রাখা পেট্রোল কারটা চোখে পড়ল রানার। প্রফেশনাল হাতে ডাল পালা দিয়ে লুকানো হয়েছে গাড়িটা। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে মত পরিবর্তন করল এডি। পেট্রোল কারের দিকে না গিয়ে ল্যান্সিয়াটার কাছে নিয়ে এল সে রানাকে।

'ওঠো।'

উঠে বসল রানা কোনমতে। সব কিছু স্বপ্নের মত লাগছে—ভীষণ ক্লান্ত ঠেকছে।

'সরে বসো—আমি চালাব।'

সরে বসল রানা। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে—ঘুম পাচ্ছে রানার—একটু যদি ঘুমিয়ে নিতে পারত!

দু'হাতে পেট চেপে কোনমতে স্টিয়ারিং হুইল বাঁচিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল এডি মরগ্যান।

গলাটা ব্যথা করছে। হাত বোলাতেই চটচটে রক্ত আঙুলে ঠেকল

রানার। বালি উড়িয়ে ছুটল গাড়িটা। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা মুখে লাগতেই মাথা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে আসছে টের পেল রানা। স্পষ্ট হয়ে উঠল সব।

কিন্তু রক্ত এল কেমন করে? স্টিয়ারিং হুইলের ওপর রাখা এডির ডান হাতের দিকে নজর পড়ল রানার। ডান হাতের কড়ে আঙুলে রয়েছে ভারী একটা অদ্ভুত ধরনের আংটি। মিনিয়েচার হাইপোডারমিক নিড্‌ল্‌ওয়ালা আংটি চিনতে দেরি হলো না রানার। ড্রাগ করা হয়েছে। সেই জন্যেই এমন ঘুম ঘুম স্বপ্নের রাজ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে ওর। সমস্ত মনোবল একত্র করে নিজেকে সজাগ করল রানা। পুলিস ইন্সপেক্টারের হাতে এই আংটি কেন? ওটা তো এসপিওনাজ এজেন্টদের ব্যবহারের জিনিস। সুমো কুস্তির কথা মনে পড়ল রানার। ফ্রান্সের পুলিস ইন্সপেক্টার এমন উন্নত মানের সুমো কুস্তি শিখল কেমন করে?

'তুমি কি "সুনা" পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'"সুনা" সম্বন্ধে তুমি আবার কি করে জানলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল এডি। অবাক হয়েছে সে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠল গর্বের ভাব।

'কোদোকানে কুস্তি দেখেছি আমি।' বলল রানা। এডির মুখটা কেমন যেন অবাস্তব দেখাচ্ছে না?

'হ্যাঁ, সুনা ধারণ করার সম্মান অর্জন করেছি আমি কোদোকানেই। কিন্তু আর কথা নয়—আরাম করে বসো—কোন চিন্তা নেই তোমার।'

আবার ঘুম ঘুম ভাবটা চেপে ধরছে রানাকে। এডির কথায় কি যেন গরমিল আছে। কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না রানা—মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে।...কোদোকান...সুমো কুস্তির পবিত্র মন্দির...বিদেশী কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ওখানে কুস্তি করতে দেওয়া হয় না। সাদা বেণীর মত সেই গ্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ানের বেল্ট ধারণ করার সম্মান অর্জনের সুযোগ কোন বিদেশী কোনদিন পায়নি। এডি কি করে সেই বেল্ট পেয়েছে?

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। এডির থুতনির ভাঁজে হাত দিয়ে দিল হ্যাঁচকা টান। বিকৃত হয়ে গেল এডির মুখ—রানার হাতে উঠে এল রবারের মুখোশটা। চ্যাপ্টা মঙ্গোলিয়ান চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। চমকে উঠল এডি মরগ্যান, পরমুহূর্তে ভীষণ আকার ধারণ করল ওর চোখ মুখ। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতে রানাকে একটা ঝাপটা মেরে হাত বাড়াল ফ্রান্সেসকোর কাছ থেকে নেওয়া ছুরিটা বের করার জন্যে। রানা বাঁ হাতে ধরে রেখেছে ছুরির খাপটা। মাতালের মত গাড়িটা রাস্তার ওপর এপাশ থেকে ওপাশ করছে। ব্রেক কষল এডি। ছুরিটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। ঠেকাতে পারেনি রানা। সমস্ত শক্তি একত্র করে শেষ চেষ্টা করল সে। হাতের আঙুলগুলো সোজা রেখে হাত চালাল এডির চোখ লক্ষ্য করে। বেশ অনেকদূর ঢুকে গেল রানার হাত। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে দু'হাতে মুখটা চেপে ধরল এডি। স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিয়েছে সে। এদিকে নিজের অজান্তেই টিপে ধরেছে অ্যাক্সিলারেটার! সোজা এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা গার্ড-রেইলের দিকে।

দরজা খুলে লাফ দিল রানা। জুডোর কায়দায় কাঁধের ওপর পড়ল—কিন্তু সামলাতে পারল না—ওর দেহটা গড়াতে গড়াতে চলল পিচ ঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে। প্রচণ্ড বেগে গাড়িটা গিয়ে গার্ড-রেইলের সঙ্গে ধাক্কা খেল। এডির প্রকাণ্ড দেহটা ছিটকে গিয়ে পড়ল নিচে সমুদ্রে।

এখানে এই অবস্থায় ধরা পড়লেই বিপদ। যতটা সম্ভব দূরে সরে যাওয়া দরকার। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার ভিতর। উঠে দাঁড়াল রানা। টলতে টলতে মাতালের মত চলছে। আর পারছে না রানা—কিসে যেন হোঁচট খেল। রাস্তার ওপর পড়ে গেল মুখ থুবড়ে, উঠবার শক্তি পেল না। মনের জোরও হারিয়ে গেছে। ক্লান্ত দেহ আর কোন আদেশ মানতে রাজি নয়—বিশ্রাম চায়। বি-শ্রা-ম ঘু-ম।

গাড়ির শব্দে আবার সজাগ হলো রানা। কতক্ষণ পর, তা মনে নেই ওর। বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াল। আর রক্ষা নেই—পালাতে হবে। নিশ্চয়ই ফ্রান্সেসকো ফিরে আসছে এডির দেরি দেখে। সামনের দিকে এগোল সে। দ্রুত এগিয়ে আসছে গাড়িটা। গাড়ির হেডলাইট পড়েছে রানার ওপর। গার্ড-রেইলের ফাঁক দিয়ে গলে ওপাশে চলে গেল সে। এসে গেল গাড়িটা। ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল দুটো বুড়ো অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। নামছে গাড়ি থেকে। সমুদ্রের দিকে দৌড় দিল রানা। কিন্তু পা টলছে। দেহের ভার রাখতে পারছে না আর। পড়ে গেল।

জ্ঞান ফিরল রানার। চোখ খুলতেই উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। রোদ। সূর্য উঠছে। আবার চোখ বুজল। চোখ বুজেই মনে পড়ে গেল গত রাতের ঘটনাটা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ঘড়িতে দেখল সকাল ছ'টা। এখনও রাস্তায় গাড়ি চলাচল আরম্ভ হয়নি। দূরে দেখা যাচ্ছে ল্যান্সিয়াটা গার্ড-রেইলের ধারে। তাহলে কাল রাতের ঘটনা সবই বাস্তব—দুঃস্বপ্ন নয়। তবে কি ফ্রান্সেসকোর আবার ফিরে আসা—রানার চোখে উজ্জ্বল আলো ধরে তাকে জেরা করা—ফ্রান্সেসকোর হলুদ দাঁত বের করা হাসি—এসব যে কাল রাতে রানা দেখল, সেগুলোও বাস্তব? নিজের শরীরটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দেখল রানা—নাহ্, শুধু গলার ব্যথাটা আর কাঁধের কাছে একটু ব্যথা ছাড়া সুস্থই আছে সে। কোথাও কোন হাড়গোড় ভাঙা নেই। ফ্রান্সেসকোর হাতে পড়লে রানাকে সে আস্ত ছাড়ত না। ওটুকু নিশ্চয়ই স্বপ্ন।

ধীর পায়ে নিজের ল্যান্সিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। বাঁদিকের বাম্পার আর উইং একেবারে দুমড়ে গেছে। কিন্তু চালানো যাবে মনে হয়। গাড়িতে বসে সেলফ দিতেই স্টার্ট নিল গাড়ি। হোটেলে না ফিরে গাড়ি ঘোরাল রানা সেই নির্জন বীচের দিকে।

পেট্রোল কারটা নেই। দ্রুত চিন্তা চলছে রানার মাথায়। ফ্রান্সেসকো যদি গাড়ি নিতে এসে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই রানাকে ও এডিকেও খুঁজেছে সে। রানার গাড়ি দেখে আশেপাশে খুঁজে রানাকে বের করা এমন কিছু কঠিন কাজ

নয়। রানাকে পেয়ে জেরাও নিশ্চয়ই করেছে। কিন্তু কতখানি জানতে পেরেছে জেরা করে ওরা ওর কাছ থেকে? যতটুকুই জেনে থাকুক না কেন রানাকে তার ভোল পাল্টাতেই হবে। শহরের দিকে ফিরল সে। যেখানে গাড়িটা ছিল সেখানে ঠিক যেমন ছিল তেমনি ভাবে রেখে দিয়ে পায়ে হেঁটে শহরে ফিরল রানা। শহরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরল। কেউ ফলো করছে না সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে কোচ স্টেশনে মার্সেইগামী কোচে উঠে বসল। মার্সেই শহরে কিছুক্ষণ ঘুরে স্যালনের বাস ধরল রানা। বেনসনের ফ্ল্যাটে পৌছে দেখল এতক্ষণ মিছেই লুকোচুরি খেলেছে সে। বেনসনের ঠিকানা ওদের অজানা নেই—হয়তো ওষুধের প্রভাবে রানা নিজেই নিজের অজান্তে জানিয়েছে ওদের। ঘরের দিকে চেয়ে মনে হয় যেন ঘরের মধ্যে বাঘ-সিংহের লড়াই হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা ড্রয়ার খোলা—ড্রয়ারের সব জিনিস মাটিতে ছড়ানো। বিছানার তোষক চিরে, সুটকেস কেটে প্রতিটি জিনিস ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

দরজা লক করে এগিয়ে গেল সে টেলিফোনের কাছে। পিটার গিল ডুক্সেম ব্যুরোর দক্ষিণ অঞ্চলের ইনচার্জ। পিটারকে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে ফিলিপ কার্টারেট রানাকে সব রকম সহযোগিতা দেয়ার জন্যে। পিটারের টেলিফোন নাম্বারে ডায়াল করল রানা—মেডিক্যাল অ্যাটেনশন দরকার ওর। এবং খুব দ্রুত। ভারসাম্য ফিরে পাচ্ছে না সে কিছুতেই। সব ঘোলাটে। বেনসনের কাভারও আর ব্যবহার করতে পারছে না রানা—অন্য কাভারে কাজ করতে হবে, যদি ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে সেরে উঠতে পারে।

'পিটার গিল্ বলছি।' শোনা গেল রিসিভারে। টেলিফোন ধরেছে পিটার। এটা পিটারের নিজস্ব নাম্বার।

'বেনসনের ফ্ল্যাট থেকে বলছি—রানা। বেনসন নেই এখানে—ফ্ল্যাটের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কোন কঠিন বিপদ ঘটেছে ওর।'

'কঠিন বিপদই বটে। আজ সকালে গুলি খেয়ে খুন হয়েছে বেনসন। ওর ফ্ল্যাটে ও একটা ইলেকট্রোনিক ডিটেকটর ফিট করেছিল। কেউ অনধিকার প্রবেশ করলেই বিপদ সঙ্কেত দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আজ সকালে মদ কিনতে বেরিয়েছিল। ওই সিগনাল পেয়ে আমাকে একটা ফোন করে একাই ছুটেছিল সে। আমাদের আরও লোক যখন পৌছায় তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, হত্যাকারী সরে পড়েছে। অসাবধানতার জন্যেই ঘটে গেল এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা।'

টুলনের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে পিটার বলল: 'মার্সেই থেকে মাইল কয়েক দূরে আমাদের নিজস্ব নার্সিংহোম আছে। আপনার তো গাড়ি নেই সঙ্গে। ঠিক আছে আপনি বেনসনের ফ্ল্যাটেই অপেক্ষা করুন। আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি। চিন্তা করবেন না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' টেলিফোন ছেড়ে দিল পিটার।

তুলো আর স্প্রিং বের করা সোফার ওপরেই একটা কম্বল বিছিয়ে নিয়ে

যতটা সম্ভব আরাম করে বসল রানা। আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাকে এই ঘরে। সময়টার সদ্ব্যবহার করবার চেষ্টা করল সে চিন্তা করে। বিক্ষিপ্ত ভাবে অনেক তথ্যই সে জেনেছে। কিন্তু কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল খুঁজে পাচ্ছে না। মেরে ফেলা হলো না কেন ওকে? তবে কি চিনতে পারেনি ওকে কবির চৌধুরী? মাহমুদ বেগের সঙ্গে যে কবির চৌধুরীর যোগাযোগ আছে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। ওরা দু'জন মিলে অ্যাকোয়া সিটির নামে যে একটা গভীর কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে সেটাও আঁচ করা যাচ্ছে—কিন্তু···

দরজার কাছে মৃদু শব্দে সোজা হয়ে বসল রানা। চাবির গর্তে সেলুলয়েড ঢুকিয়ে খুলবার চেষ্টা করছে কেউ। দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে দরজার পাশে পৌঁছে গেল রানা। হাতলটা ঘুরছে আস্তে আস্তে। খুলে গেল দরজাটা। লোকটা ঘরের মধ্যে পা বাড়াতেই রানার লাথি গিয়ে পড়ল লোকটার পিস্তল ধরা হাতের কব্জিতে। ছিটকে গিয়ে পড়ল পিস্তলটা একটা তুলো বের করা সোফার ওপর। ঘুরে দাঁড়াল লোকটা।

ক্যাপ্টেন সন্ডার্স!

রানাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল ক্যাপ্টেন। চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেছে—তোতলাতে আরম্ভ করল সে। 'আ—আ—আপনি? কি করে সম্ভব? কিছুক্ষণ আগেই আমি···'

'গুলি করে খুন করেছ আমায়—এই তো?' কথা যুগিয়ে দিল রানা। মরা মানুষকে জ্যান্ত হয়ে উঠতে দেখে একেবারে বোকা বনে গিয়েছে ক্যাপ্টেন সন্ডার্স। হঠাৎ সামলে নিয়েই প্যান্টের ডান পকেটে হাত ঢোকাল সে। এরকম একটা কিছুর জন্যে তৈরিই ছিল রানা—এক লাফে গিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেনের ওপর। হাত মুচড়ে হ্যামার লক মেরে পেড়ে ফেলল তাকে মেঝের ওপর উপুড় করে। ছুরিটা বের করে নিল ওর পকেট থেকে।

ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের সঙ্গে এমন ভাবে আবার দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবেনি রানা। টুলনে এডি মরগ্যানের সঙ্গে ক্যাপ্টেন সন্ডার্সকে দেখা করতে দেখে ধারণা করে নিয়েছিল সে হিট অ্যান্ড রান অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করায় এডি মরগ্যানের নির্দেশেই ইনফরমার হিসেবে রিপোর্ট করেছে ও রানার কথা। কিন্তু সন্ডার্সকে বেনসনের ফ্ল্যাটে দেখে এখনও সন্দেহ হচ্ছে হয়তো ওরকম কোন অ্যাক্সিডেন্টই ঘটেনি—হতে পারে পুরো ব্যাপারটাই ওর মনগড়া। ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের জবানবন্দী ছাড়া আর কোন প্রমাণই যখন নেই—অসম্ভব কি?

যে করেই হোক এর কাছ থেকে কথা বের করতে হবে। ছুরি দিয়ে শব্দ করে ফেড়ে ফেলল রানা ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের কোটটা পিঠের দিকের কলারের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত। শিউরে উঠল ক্যাপ্টেন সন্ডার্সের দেহ। বলির পাঁঠার মত কাঁপছে সে ভয়ে। রানা যে দরকার পড়লে কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে সেটা বুঝে নিয়েছে সে পরিষ্কার।

'অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা কি তোমার নিজের মনগড়া কাহিনী? সত্যি কথা

চাই আমি—নইলে খুন করে ফেলব।' ছুরি বিঁধাল রানা ক্যাপ্টেনের শোল্ডার ব্লেডের ওপর।

যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল ক্যাপ্টেন, 'কসম খেয়ে বলছি, মিথ্যে বলিনি আমি। নিজের চোখে আমি দেখেছি মেয়েটাকে গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যেতে। এডি মরগ্যান আমাকে বলেছিল, কেউ যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওকে জানালে একশো ফ্র্যাঙ্ক দেবে। টাকার লোভে জানাতে গিয়েই আমার এই অবস্থা। এডি বলছে ওর কথামত না চললে খুন করে ফেলবে আমাকে। ওকে সবাই ভয় করে। ও পারে না এমন কাজ নেই।'

'ইন্সপেক্টার এডি মরগ্যান সম্বন্ধে বলো এবার যা জানো।'

'কিছুই জানি না। খোদার কসম। ছ'মাস আগে বদলি হয়ে এসেছে কোথা থেকে যেন। সাঙ্ঘাতিক কড়া।'

'আর ফ্রান্সেসকো?'

'নিচে অপেক্ষা করছে ফ্রান্সেসকো। ও-ই আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে আপনার ফ্ল্যাট সার্চ করার জন্যে।'

'আমি মনে করে অন্য একটা লোককে খুন করেছ তুমি—তাই না?' ছুরির খোঁচা দিল আবার রানা।

'গেছিরে বাবা—আমি না—বিশ্বাস করুন, ফ্রান্সেসকো মেরেছে ওকে।'

'আবার ফেরত এসেছ কেন?'

'লাশটার হাতে ইঞ্জেকশনের দাগ পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছে আমাকে ফ্রান্সেসকো।'

ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি টের পেল রানা। নিঃশব্দে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে ফ্রান্সেসকো। দ্যুপ করে আওয়াজ হলো সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের। ক্যাপ্টেন সভার্সের মাথাটা ফুটো হয়ে গেল গুলির আঘাতে। হাঁটু গেড়ে বসেছিল রানা। গুলির শব্দে বাঁ হাঁটুর ওপর দেহটা ঘুরিয়ে ওই অবস্থাতেই ছুরিটা ছুঁড়ে মারল দরজার সামনে দাঁড়ানো ফ্রান্সেসকোর দিকে। ছুরির বাঁটটা গিয়ে পড়ল ফ্রান্সেসকোর পিস্তল ধরা হাতের ওপর। গুলি করল ফ্রান্সেসকো। রানার ডান কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। এক লাফে চলে এসেছে রানা দরজার কাছে। ফ্রান্সেসকো দ্বিতীয়বার রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করবার আগেই প্রচণ্ড এক লাথি গিয়ে পড়ল তার তলপেটে। একই সঙ্গে কারাতের চপ মারল সে পিস্তল ধরা হাতটার ওপর। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেঁকে গেল ওর হাতটা। উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল ফ্রান্সেসকো পিস্তলটার ওপর। দ্যুপ করে শব্দ হলো পিস্তলের। ঠেলা দিয়ে চিৎ করে ফেলল রানা ফ্রান্সেসকোর দেহ। গুলিটা ওর বুক ভেদ করে চলে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। বেচারার এই পরিণতি হবে জানলে এত জোরে মারত না সে ওকে।

ফ্রান্সেসকোর দেহটা টেনে ক্যাপ্টেন সভার্সের দেহের পাশে নিয়ে গেল রানা। সার্চ করে দু'জনের কারও কাছেই গোটাকয়েক নোট আর ভাঙতি

পয়সা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।

এবার নিজের দিকে মন দিল রানা। কাঁধের কাছটাতে চটচট করছে। অবশ হয়ে রয়েছে জায়গাটা। ফ্রান্সেসকোর গুলিটা কাঁধের খানিকটা মাংস খুবলে নিয়ে গেছে।

ইঞ্জেকশন! হ্যাঁ, বাঁ হাতের ছোট্ট লাল ক্ষতটা খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগল না রানার। এবারে নিঃসন্দেহ হলো সে, গত রাতে দেখা ফ্রান্সেসকোর মুখ, তীব্র আলো, এসব স্বপ্ন ছিল না। কিন্তু আবার সেই আগের প্রশ্নটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল রানার মনে। তাকে মেরে ফেলল না কেন ওরা? আর ইঞ্জেকশনের দাগ পরীক্ষা করবার জন্যেই বা আবার কেন ফিরে এল? তবে কি টুথ সিরামের সাথে পোলোনিয়াম ২১০ জাতীয় কিছু ইনজেক্ট করা হয়েছে তার শরীরে? হ্যাঁ, মিলে যাচ্ছে। এই কারণেই ফ্রান্সেসকোর হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে রানা। ভ্রাম্যমাণ ট্র্যান্সমিটারে পরিণত হয়েছে রানার শরীর। রানা যেখানেই থাকুক না কেন গাইগী কাউন্টারে ধরা পড়বে তার সঠিক অবস্থান। রানার কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে বেনসনের ফ্ল্যাট সার্চ করছিল ওরা, এমনি সময় সিগনাল পেয়ে ফিরে এসেই গুলি খেয়েছে বেনসন। বেনসনকে মেরে ফেরার পথে নিশ্চয়ই ওদের গাইগী কাউন্টার অন করা ছিল। রানার বাস ক্রস করার সময় কাউন্টারে ধরা পড়ে। ঘটনাটা নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল ওদের। সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত ঝুঁকি নিয়েই ফিরে এসেছিল ওরা ব্যাপারটা যাচাই করে দেখার জন্যে। উঠে দাঁড়াল রানা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। রক্তের দাগ ঢাকার জন্যে নিজের জ্যাকেটটা খুলে ফেলে বেনসনের একটা জ্যাকেট পরে নিল। বেনসনের ফ্ল্যাটের সামনে পার্ক করা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল রানা। সীটের ওপর রাখা গাইগী কাউন্টারটা কর্‌র্‌র্‌ একটানা শব্দ করে চলেছে। ওটা হাতে নিতেই শব্দটা আরও জোরদার হয়ে উঠল। অফ্ করে দিল ওটাকে রানা। ফিরে এল বেনসনের কামরায়। তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার।

পাঁচ

অস্পষ্ট গুঞ্জন কানে আসছে রানার। কারা যেন কথা বলছে ঘরের মধ্যে। কানে এল কে যেন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, যা বলেছিলাম মিস্টার গিল্—এই ধরনের অপারেশন আজকাল হামেশাই হচ্ছে। শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, ছোট্ট একটা অপারেশন করে দেহের রক্ত একদিক দিয়ে বের করে নিয়ে একটা বিশেষ ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধ করে সেই রক্তই আবার অন্য পথে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফিল্টারটাই আসলে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। উজ্জ্বল আলো। বার কয়েক চোখ মিটমিট

করতেই আলোটা সহ্য হয়ে এল চোখে। একে একে সব ঘটনাই মনে পড়ল ওর। পিটার গিলের আগমন, ফ্রান্সেসকো আর ক্যাপ্টেন সভার্সের মৃতদেহের ব্যবস্থা করে রানাকে নার্সিং হোমে নিয়ে আসা। পরের ঘটনাগুলো অবশ্য রানার কাছে অস্পষ্ট। আবছা ভাবে মনে আছে অনেকবার করে রক্ত পরীক্ষার কথা, পিটার গিলের দৌড়াদৌড়ি। ব্লাড্ ট্রান্সফিউশন, অপারেশন···

'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম আমি?' প্রশ্ন করল রানা।

'চারদিন হলো আপনি এসেছেন আমাদের এখানে।' হেসে জবাব দিল সাদা অ্যাপ্রন পরা ডাক্তার।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল রানা, বাধা দিয়ে আবার শুইয়ে দিল ডাক্তার।

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই, আরাম করুন। অন্তত আরও একটা দিন আপনাকে থাকতে হবে আমাদের এখানে। আপনার রক্তটা আবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে ফিল্টারে কতখানি কাজ হয়েছে।' তারপর পিটার গিলের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি নার্সকে বলে দিচ্ছি, কেউ আপনাদের আগামী পনেরো মিনিটের মধ্যে বিরক্ত করবে না। কিন্তু তাড়াতাড়ি আপনাদের কথা সেরে নিতে হবে, বিশ্রাম দরকার পেশেন্টের।' কেবিনের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল ডাক্তার।

'কেমন বোধ করছেন এখন?' এতক্ষণে মুখ খুলল পিটার গিল।

'চমৎকার। কাঁধের কাছে সামান্য ব্যথাটা না থাকলে টেরই পেতাম না আমার কিছু হয়েছিল।'

'ফ্রান্সের সেরা ডাক্তার আপনার চিকিৎসা করছেন। ভাল না হয়ে উপায় আছে? সত্যি—ডক্টর গর্মে ডুক্সেম ব্যুরোর এই নার্সিং হোমে আছেন বলে আমরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করি। যত কঠিন আর যত বিদঘুটে কেসই আসুক না কেন একটা না একটা উপায় উনি ঠিকই বের করে ফেলেন। আর জানেন তো এই লাইনে বিদঘুটে কেসের অভাব নেই। এই আপনাদের কেসটাই ধরুন না—ওই বিশেষ ফিল্টারটা ওঁরই আবিষ্কার।'

'ওদিককার কোন খবর পেলেন?' পনেরো মিনিট সময় হাবিজাবি বকেই হয়তো কাটিয়ে দেবে এই ভয়ে রানা সোজাসুজি কাজের কথা পেড়ে বসল।

'খুব একটা এগুতে পারিনি। বস্—মানে মিস্টার কার্টারেট তিন-চার-বার করে আপনার কুশল জানার জন্যে আমায় এখানে পাঠিয়েছেন প্রতিদিন। কড়া অর্ডার, নিজে দেখে গিয়ে টেলিফোনে রিপোর্ট দিতে হবে। তবু নিজে সময় না পেলেও অন্য লোক লাগিয়ে রুটিন চেক কিছু করিয়েছি। বস্ দেখলাম আপনার জন্যে খুব উদ্বিগ্ন। আপনাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা আছে বুঝি?'

'আমরা এক সঙ্গে কিছু কাজ করেছি, সেই থেকেই যা ঘনিষ্ঠতা। হ্যাঁ, রুটিন চেক কিছু করিয়েছেন বলছিলেন?' আবার কাজের দিকে কথার মোড় ঘোরাল রানা।

'ক্যাপ্টেন সভার্সের খবর একেবারে তার জন্মের সময় থেকে নিয়ে মৃত্যু

পর্যন্ত সঠিক জানা গেছে। লোকটা লোভী ছিল, কিন্তু কোন ক্রিমিনাল রিপোর্ট নেই ওর বিরুদ্ধে।'

'আর ফ্রান্সেসকো?'

'ফ্রান্সেসকো আর এডি মরগ্যান দু'জনেরই জন্ম গত এক বৎসরের মধ্যেই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এক বৎসরের বেশি কারও সম্পর্কেই কিছু জানা সম্ভব হয়নি অনেক চেষ্টা করেও।'

'তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ওরা কেউই এখানকার স্থানীয় লোক নয়। এডি হচ্ছে জাপানী আর ফ্রান্সেসকো সম্ভবত টিবেটান। জায়গামত খুঁজলে ওদের দুজনেরই বিরাট বিরাট ক্রিমিনাল রেকর্ড পাওয়া যাবে।'

'প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ড বর্তমানে কোন্ প্রজেক্টে কিসের ওপর কাজ করছে বলতে পারেন?'

'মিস ব্র্যান্ড নি-বিউসেতে একটা গভমেন্ট প্রজেক্টে কাজ করছেন। বর্তমানে ছুটিতে আছেন উনি। কিন্তু ওই প্রজেক্টের যে কি কাজ তা কিছুতেই বের করা গেল না। টপ সিক্রেট।'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে কি ভাবল রানা, তারপর বলল, 'মিস্টার কার্টারেটকে আমার হয়ে আজই জানাবেন যে যত সিক্রেটই হোক ওই প্রজেক্টের মঙ্গলের জন্যেই আমাদের জানা দরকার ওরা কি কাজ করছে। আমার বদ্ধমূল ধারণা যে মিস ব্র্যান্ডের সঙ্গে যখন কবির চৌধুরীকে দেখা গেছে প্যারিসে, তখন আগে থেকে সাবধান না হলে ওই সিক্রেট প্রজেক্টের কোন না কোন অমঙ্গল সে ঘটাবেই। ভয়ঙ্কর লোক ওই কবির চৌধুরী।'

নার্স এসে ঢুকল ঘরে। অর্থাৎ পনেরো মিনিট শেষ। বেরিয়ে গেল পিটার গিল। এতক্ষণে সরাসরি তাকাল রানা নার্সের দিকে। তাকিয়েই চমকে উঠল। 'সোহানা! তুমি এখানে কি করছ?'

ছুটে এসে রানাকে জড়িয়ে ধরে এলোপাতাড়ি চুমোতে ভরিয়ে দিল সোহানা। রানার জ্ঞান ফিরেছে দেখে বাচ্চা মেয়ের মত খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে সে। খুশির আবেগ একটু কমলে রানা আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলে নার্সের বেশে?'

'হুকুম। তোমাদের বুড়োমিঞার। আমার ওপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এক মুহূর্তও যেন তোমাকে চোখের আড়াল না করি। যদি তোমার কিছু ঘটে যায় জবাবদিহি করতে হবে আমাকে। ফিলিপ কার্টারেটের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে উনিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আরও অনেক ব্যাপার আছে। এই অ্যাসাইনমেন্টে তোমার সঙ্গে আমাকেও কাজ করতে বলা হয়েছে হেডকোয়ার্টার থেকে। কিন্তু সেসব কথা পরে শুনো। ডক্টর গর্মে বলেছেন কমপ্লিট রেস্ট দরকার তোমার এখন। বিপদ সম্পূর্ণ কাটেনি এখনও।'

'তিনচারদিন তো ঘুমিয়েই কাটালাম। আর কত রেস্ট? আস্তে করে উঠে

এসো দেখি বিছানায়—ভাল মত রেস্ট নেয়া যাক।'

ক্যান্টিন নার্স খাবারের ট্রলি নিয়ে ঘরে ঢুকল। বয়স্কা। হাসি হাসি মুখ। রানাকে বিছানার ওপর আধবসা অবস্থায় দেখে বলল, 'বাহ্, আমাদের হ্যান্ডসাম নিউ পেশেন্ট এরই মধ্যে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে দেখছি! যাক, এবার সোহানার মুখে হাসি দেখতে পাব আমরা। বেচারী একেবারে মনমরা হয়ে ছিল এ ক'দিন দুশ্চিন্তায়।'

সোহানার চোখের দিকে চাইল রানা। চট্ করে চোখটা নামিয়ে নিল সোহানা। ক্যান্টিন নার্স বেরিয়ে যেতেই ওর হাত ধরে মৃদু টান দিল রানা নিজের দিকে।

'এখন না, লক্ষ্মী। পাগলামি করে না। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে শীঘ্রিই সাগরতীরে বেড়াতে যাচ্ছি আমরা। আপাতত আমি তোমার বডিগার্ড।'

ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল সমুদ্রের ধারের ছোট্ট হোটেলটার সামনে। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হেইন্স্ নামে বুক করা হয়েছে হোটেলের সবচেয়ে সুন্দর স্যুইটটা রানা আর সোহানার জন্যে। সব ব্যবস্থা সোহানাই করেছে। হোটেল রেজিস্টারে সই করে দিতেই বেলবয় সুটকেস দুটো ওদের জন্যে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা স্যুইটে পৌঁছে দিয়ে গেল। দুজনেরই পছন্দ হয়েছে স্যুইটটা। মাঝারি গোছের একটা হল-রূম। মডার্ন ফারনিচার। সাইড-টেবিলের ওপর টেলিফোন রাখা আছে। ওপাশে একটা নতুন টেলিভিশন সেট। ঘরের মাঝামাঝি বিরাট একটা বে-উইনডো। পুরো সমুদ্রের ভিউটাই পাওয়া যায় ওখান থেকে।

টক্ টক্ টক্। দরজায় নক শোনা গেল। ওরা কাউকে আশা করছে না এই সময়ে। ওরা এখানে আছে সে কথা কারও জানার কথাও নয় একমাত্র ফিলিপ কার্টারেট ছাড়া।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বেল বয়, স্যার।'

'দরজা খোলাই আছে, ভিতরে এসো।' আদেশ করল রানা।

একটা ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ভিতরে ঢুকল বেল বয়। ট্রলির ওপরে আইস বাকেটে রাখা রয়েছে একটা শ্যাম্পেনের বোতল। পাশেই রাখা দুটো গ্লাস।

'ট্র্যাডিশন, স্যার। ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে হানিমুন কাপ্লের জন্যে শুভেচ্ছা।'

আস্তে করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল বয়।

শ্যাম্পেন ঢেলে একটা গ্লাস সোহানাকে দিয়ে অন্যটা নিজে নিল রানা।

বীচে রানা আর সোহানা ছাড়া জনপ্রাণী নেই। পড়ন্ত বিকেল। হোটেল থেকে নিয়ে আসা বিরাট বেডশীটটা বিছিয়ে বসেছে ওরা সমুদ্রের ধারে। হোটেল

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সব রকমের স্পেশাল খাতির পাচ্ছে ওরা হানিমুন কাপ্‌ল্ হিসেবে। বার থেকে এই একটু আগে কয়েকটা বোতল পৌঁছে দিয়ে গেল বাঁচে। বলে গেল, দামের জন্যে চিন্তা করতে হবে না, যা বাঁচবে সব ফেরত নেবে—যতটুকু খাওয়া হবে কেবল সেইটুকুরই দাম নেবে ওরা। একেবারে গায়ে পড়েই আদর করছে ব্যাটারা। ট্র্যাডিশন!

'সারাটা জীবন হানিমুন কাপ্‌ল্ হয়ে কাটাতে পারলে মন্দ হত না।' একটা গ্লাসে ড্রিংক ঢালতে ঢালতে মন্তব্য করল রানা।

'সত্যিই। স্বপ্নের মত কেটে গেল ক'টা দিন। তাই না?' টেপ রেকর্ডারের আওয়াজ একটু কমিয়ে দিল সোহানা। 'জীবন যে এত সুন্দর হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।'

টপ টোয়েন্টি বাজছে রেকর্ডারে। প্যারিস থেকে এসেছে এটা কিছুক্ষণ আগে। দিয়ে গেছে ফিলিপ কার্টারেটের লোক। সাথে দুটো ক্যাসেট। একটায় টপ টোয়েন্টি, অপরটায় গোপন মেসেজ।

'তোমার জন্যে কি ঢালব, সোহানা?'

'এমনিতেই মাতাল হয়ে আছি, রানা ওসব ছাইপাঁশ আর খাব না।' রানার চুলে বিলি কাটতে কাটতে টুক করে একটা চুমো খেল সোহানা ওর কপালে।

ট্রাম্পেটের নস্টালজিক কলজে-ছেঁড়া সুরে কেমন যেন টনটন করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙছে তীরে এসে—অবিরাম। অলস ভঙ্গিতে উড়ছে সীগাল। বহুদূরে একটা জাহাজের অস্পষ্ট আভাস। সোহানার একটা হাতে মৃদু চাপ দিল রানা।

'সত্যি কথা বলব?'

'বলো।'

'জীবনে এত ভাল আর কাউকে কোনদিন লাগেনি আমার।'

রানার চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল সোহানা। 'কিন্তু তবু...'

'আর কোন "কিন্তু তবু" নেই, সোহানা কদিন ধরেই ভাবছি কথাটা। আর কত? এবার দেশে ফিরেই...বুঝলে? শুধু শুধুই কষ্ট দিচ্ছি আমরা নিজেদের। আমি যেমন জানি তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না, তেমনি তুমিও জানো, আমাকে ছাড়া তুমি অসম্পূর্ণ। ভেবে দেখলাম, তুমি যদি বলো, অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারব আমি বিসিআই।'

'সেটা আমি কোনদিনই বলব না, রানা। তোমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক পা এদিক ওদিক যেতে বলব না আমি কোনদিন।'

'কেন? তোমার খারাপ লাগবে না?'

'কেন লাগবে? তুমি বদলে গেলে আমারই তো ক্ষতি। যে রানাকে ভালবাসি, তাকে কি আর পাব বদলে নিলে? দোষে-গুণে তুমি যা, সেই সম্পূর্ণ মানুষটাকে মন দিয়ে তাকে আবার বদলাতে যাওয়া বোকামি না?'

'তার মানে তুমি বলতে চাও, তোমার মেজাজটা এমনি তিরিক্ষিই রাখবে,

বদলাবে না কিছুতেই?'

'আমি তোমার দাসী হয়ে গেলে আর ভালবাসতে পারবে?'

'না। তা পারব না। রাণী হয়ে থাকবে তুমি আমার ঘরে। ঠিক আছে। রাণীদের একটু মেজাজ থাকেই। অলরাইট, মেনে নিলাম। এক-আধদিন ফায়ারিং বেশি হয়ে গেলে রানা এজেন্সি তো রইলই। রাত কাটিয়ে দেয়া যাবে সোফায় শুয়ে। কিন্তু এখন সমস্যাটা হচ্ছে: বুড়োমিঞাকে ব্যাপারটা জানাবে কে? তুমি না আমি?'

'তুমি।'

'উঁহুঁ। তুমি।'

'অসম্ভব! এক ধমকে আমার পিলে চমকে দেবে।'

'আমার পিলেটাই কি আস্ত রাখবে? তুমিই যদি সাহস না পাও, আমি কোথাকার কে?'

'তুমি মেজর জেনারেলের কোথাকার কে সেটা আমি কোনদিন বোঝাতে পারব না তোমাকে। ওঁর কাছে তুমি যে কতখানি কি সেটা বুঝি আমরা। সোহেল...'

'ঠিক বলেছ। সোহেল ব্যাটাকেই পাকড়াব ঘটক হিসেবে। ওকেই পাঠাব।'

'ও যেতে রাজি হবে? ওর প্রাণে ভয়ডর...'

'রাজি হবে না মানে? পিটিয়ে লাশ করে ফেলব না শালাকে? এই সামান্য বিপদ ঘাড়ে নেবে না, তাহলে কিসের বন্ধু? ওকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে ঠিক পাঁচমিনিট পর ঢুকব আমি। ব্যস, আর কোন চিন্তা নেই। একমাত্র চিন্তা এখন, বুড়ো আমাকে অ্যাকটিভ ফিল্ড থেকে সরিয়ে ডেস্কে না বসিয়ে দেয়।'

'সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না। ফিল্ডে আমাদের আর যোগ্য লোক কোথায়? তোমাকেই পাঠাবে, ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে আমার, পাঁচ ওয়াক্ত খোদাকে ডাকব, আর ওদিকে তুমি হয়তো কোন সুন্দরীকে নিয়ে...'

'অসম্ভব। এই একটা ব্যাপারে আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে অনুরোধ করব আমি তোমাকে, সোহানা। বিয়ের আগে ওসব এক কথা, কারও সঙ্গে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ নই আমি; কিন্তু বিয়ের পর বিশ্বাস ভঙ্গ করে গোপনে অন্য নারীর সঙ্গে ফূর্তি করাকে আমি ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করি।'

'যদি কাজের খাতিরে এর দরকার পড়ে?'

'সে ধরনের কাজে না গেলেই হলো। কোন খাতিরেই এই ব্যাপারটাকে বরদাস্ত করতে আমি রাজি নই।'

'প্রেজুডিস। অবশ্য এটা আমার জন্যে মস্ত সুখবর। যত মহৎই হোক কোন নারীই সহ্য করতে পারে না তার স্বামীকে অন্য স্ত্রী-লোকের...কিন্তু প্রয়োজন হলে সেটাও সহ্য করে নেব ভেবেছিলাম।' মৃদু হাসল সোহানা। 'বাঁধনের মধ্যে এনে তোমাকে খর্ব করতে চাইনি আমি কোনদিক থেকেই।'

'আমি নিজেই যদি লিমিটেশন আরোপ করি, তাহলে আপত্তি নেই

নিশ্চয়ই?'

'তোমার যা ভাল মনে হবে তাই করবে।'

'গুড। মজা যা লোটার লুটে নিতে হবে আমার বিয়ের আগেই। এসো।'

'অ্যাই, না, এখানে কি!' দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল সোহানা রানাকে। 'প্লীজ, হোটেল থেকে সব দেখা যায়।'

'এতদূর থেকে কে কি বুঝবে? মনে করবে জাস্ট গল্প করছি।'

'বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে কেউ আমাদের ওপর নজর রাখছে না তা কে বলতে পারে? এখন না, প্লীজ!'

'ঠিক আছে। সন্ধ্যেটা নামুক, তখন আর কারও নজর রাখতে হচ্ছে না! এবার তাহলে আমাদের কাজটা সেরে নেয়া যাক? তুমি আমার দিকে মুখ করে বসো, নজর রাখো পেছন দিকটায়, আমি তোমার দিকে মুখ করে নজর রাখছি তোমার পেছনে। রেডি?'

ক্যাসেট পাল্টে প্লে লেখা বোতামটা টিপে দিতেই পরিষ্কার ভেসে এল ফিলিপ কার্টারেটের ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'এই টেপটা স্পেশাল ম্যাগনেটিক হেড দিয়ে রেকর্ড করা হয়েছে। একবার বাজালেই আপনা আপনি মুছে যাবে আমার কথাগুলো। সুতরাং, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

'প্যাট্রিসিয়া ব্যান্ডের কাজ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে সে এমন গুরুত্বপূর্ণ আর গোপনীয় সরকারী প্রজেক্টে কাজ করছে যে সেই প্রজেক্টের কথা স্বয়ং প্রেসিডেন্ট, তিনজন চীফ অভ স্টাফ্ এবং যে ক'জন বৈজ্ঞানিক কাজ করছেন ওই প্রজেক্টে, এঁরা ছাড়া আর কেউই জানে না।

'বাংলাদেশ থেকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে কবির চৌধুরীর কীর্তিকলাপের পূর্ণ বিবরণ আমার হাতে পৌঁছেচে। ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে আমি নিজে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব জানিয়েছি। উনি এ ব্যাপারে তোমাকে ডুক্সেম ব্যুরোর পরিপূর্ণ সহযোগিতা দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

'লি-বিউসের নিষিদ্ধ এলাকায় ফ্রান্সের সেরা সব বৈজ্ঞানিক একত্র হয়ে কমপ্যাক্ট অথচ খুবই ক্ষমতাশালী একটা আনবিক মিসাইল তৈরি করছেন। ওটা এতই শক্তিশালী যে যার কাছে ওটা থাকবে সে চাইলে সারা পৃথিবীকে তার কথা মত চলতে বাধ্য করতে পারবে। আমেরিকা ও রাশিয়াতেও এত শক্তিশালী নিউক্লিয়ার ওয়ার-হেড এখনও কল্পনা মাত্র। ড্রইং বোর্ড স্টেজেও আসেনি।

'প্যাট্রিসিয়া ব্যান্ডের কথায় আবার পরে আসছি—কিন্তু তার আগে মাহমুদ বেগ, জিমি ক্রিদারো, প্রফেসার ব্যান্ড আর অ্যাকোয়াসিটি সম্বন্ধে যা আমরা জানতে পেরেছি সেটা বলে নেই। জিমি ক্রিদারোকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক। ওর জন্ম প্রাগে। বয়স চুয়ান্নর কাছাকাছি। জাতে জার্মান। পেশা সার্জেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেশত্যাগ করে। বিভিন্ন দেশে

প্র্যাকটিস্ করার পর বছর তিনেক আগে সে ফ্রান্সে নাগরিকত্ব নিয়েছে। সেই থেকে ফ্রান্সেই আছে। শোনা যায় খুবই দক্ষ সার্জেন জিমি ক্লিদারো। এখন সে সেমি-রিটায়ার্ড। বেগ সিটিতেই থাকে। চিকিৎসক হিসেবে কখনও কখনও দুই একজন বিশেষ ব্যক্তিকে দেখে। তবে সেটা নেহাতই ব্যক্তিগত খাতিরে। জিমি ক্লিদারো যাদের দেখে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রফেসার আর্থার ব্র্যান্ড—প্যাট্রিসিয়ার বাবা। মাস ছয়েক আগে প্রফেসরের স্ট্রোক হবার পর থেকেই জিমি ক্লিদারো প্রাইভেট চিকিৎসা করছে তাঁর। তবে বেশির ভাগ সময়ই সে মাছ ধরে কাটায়। মাছ ধরাটা ওর নেশা।'

চট করে রানা আর একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিল এদিক ওদিক। নাহ্, কেউ নেই আধ মাইলের মধ্যে।

'এবার আসা যাক প্রফেসার আর্থার ব্র্যান্ডের কথায়। সবাই জানে এটমিক সাবমেরিন উদ্ভাবনে ওঁর অবদানের কথা। উনি যে হিটলারের উপদেষ্টা ছিলেন পানির নিচের সব ব্যাপারে, সে কথা ইচ্ছে করেই চেপে দেয়া হয়েছিল যুদ্ধের পর ওঁর ব্রেনটা নিজেদের কাজে লাগাবার জন্যে। দুইজন মানুষ চালিত সাবমেরিন "স্নরকেল" ওঁরই আবিষ্কার। আর ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে টানেল করে ইংল্যান্ড আক্রমণ করার প্ল্যানও বেরিয়েছিল ওঁর মাথা থেকেই। তবে হিটলারের মত লোকও ওই প্ল্যানটাকে একটু বাড়াবাড়ি মনে করায় ওটা আর বেশি দূর এগোয়নি। যুদ্ধের পরে নিউরেমবার্গ ট্রায়েলে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁকে ফ্রান্সে নিয়ে আসা হয়। বিশেষ যত্নের সঙ্গে ওঁর অতীতকে অনেকটা ধামা চাপা দেওয়া হয়। জনসাধারণের কাছে ওঁকে একজন সৎ নাৎসী-বিরোধী জার্মান বলে তুলে ধরা হয়। ওঁর নিজস্ব মতবাদ যে ঠিক কি তা জানা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রফেসার ব্র্যান্ড খুবই চাপা প্রকৃতির লোক। অনেকদিন ওঁর ওপর নজর রেখে এটুকু পরিষ্কার বোঝা গেছে যে উনি একেবারেই রাজনৈতিক মতবাদহীন মানুষ। যত প্রজেক্ট আছে তার মধ্যে পানির তলার প্রজেক্টগুলোর ব্যাপারেই উনি উৎসাহী। আর পরিশ্রমও করেন আপ্রাণ। এই কারণেই উনি বেগ সিটিতে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রিটায়ার করার পর—অ্যাকোয়াসিটির কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারবেন বলে। মাহমুদ বেগ একটা মোটামুটি ভাল টাকা দেয় প্রফেসার ব্র্যান্ডের খরচা চালানোর জন্যে। সেই সঙ্গে বেগ সিটিতে বিনা ভাড়াতেই থাকার ব্যবস্থাও হয়েছে। বিনিময়ে উনি অ্যাকোয়াসিটির কাজে সাহায্য করছেন।

'মাহমুদ বেগ সম্বন্ধে বলতে গেলেই প্রথম যে কথাটা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে 'টাকা'। হ্যাঁ টাকা আছে লোকটার। সারা জীবন সে কেবল টাকা রোজগার করেছে। যা কিছুতে ও হাত দিয়েছে তাতেই সোনা ফলিয়েছে। টেক্সাসের কয়েকটা তেলের খনির মালিক মাহমুদ বেগ। রোডেশিয়ান পার বেল্ট-এ ওর পঁচিশ পারসেন্ট শেয়ার আছে। সাউথ আফ্রিকার ডায়মন্ড মাইনে ওর শেয়ার আছে চল্লিশ পারসেন্ট। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কবির চৌধুরী সাউথ আফ্রিকা থেকে ডায়মন্ড স্মাগলিং এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

সম্ভবত ওটা মাহমুদ বেগের অন্যান্য শেয়ার-হোল্ডারদের ঠকিয়ে কিছু বাড়তি টাকা বাঁচিয়ে নেওয়ার একটা ফিকির। যাক সে কথা। আসল কথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম আমি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—মাহমুদ বেগ জাতে ইহুদি—ইসরাইলে জন্ম—বিয়ে করেনি এখনও। তবে না করার কারণ নারীতে অনাসক্তি নয়। বরং মাত্রাধিক আসক্তি বলা যেতে পারে। সিসিতে তার বিরাট ভিলায় সিনেমা স্টার, শো গার্ল আর মডেল মিলিয়ে ছোট-খাট একটা হেরেমই ছিল। অ্যাকোয়াসিটি বানাতে চাওয়ার কারণ হিসেবে মাহমুদ বেগ ফ্রেঞ্চ গভমেন্টকে জানিয়েছিল যে সমুদ্রের নিচে তার যে তেলের খনি আছে সেটাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তার বিশ্বাস যে সেরকম ভাবে করতে পারলে পানির তলায় একটা ছোটখাট শহর গড়ে বসবাস করা সম্ভব। তবে সবজান্তা মহল থেকে শোনা যায় যে সে নাকি তার বর্তমান প্রেয়সীর জন্যেই বানাচ্ছে অ্যাকোয়াসিটি। সারা জেন হবে অ্যাকোয়াসিটির সেরা আকর্ষণ। পানির তলায় ব্যালে নৃত্য পরিবেশন করবে সারা জেন।

'আমাদের অনুসন্ধানে অ্যাকোয়াসিটির ব্যাপারে সন্দেহজনক কিছুই ধরা পড়েনি। বেগ করপোরেশনকে তিরিশ কোটি ফ্র্যাঙ্ক-এর ডেভেলপমেন্ট পারমিট দেওয়া হয়েছে। তিন বৎসরের মধ্যে ওদের কাজ সমাপ্ত করার কথা। প্রোগ্রেস কমিশনের সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ হলে তিরিশ বৎসরের জন্যে অপারেটিং পারমিট দেওয়া হবে। কয়েকটা বড় ফার্ম অ্যালুমিনিয়াম, গ্লাস, স্পেশাল টিউব ইত্যাদি ফ্রী সাপ্লাই দিচ্ছে প্রচারের লোভে।

'ট্রিসা ব্যান্ড তার বাবার সঙ্গেই এদেশে আসে, এবং প্রফেসর ব্যান্ডের সাথে তাকেও স্বভাবতঃই এদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। বাবার মেধাটা সে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এই বয়সেই ট্রিসা তার নিজস্ব বিষয়ের অর্থাৎ ইলেকট্রোনিক সারকিট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। হ্যাফনিয়াম আর ট্যানটালাম-এর সংমিশ্রণে ব্যান্ডিনিয়াম আবিষ্কার করেছে সে। চারহাজার সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ সহ্য করতে পারে ব্যান্ডিনিয়াম। প্যাট্রিসিয়া ব্যান্ডের সম্মানার্থে ওটার নামকরণ করা হয়েছে ব্যান্ডিনিয়াম।'

হালকা ভাবে শিস দিয়ে উঠল রানা।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল সোহানা

'ট্রিসার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। কিন্তু সেই ট্রিসার কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না!'

'বিছানায় সম্পূর্ণ অন্যরকম—এই তো বলতে চাও? সেটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই নয়।'

আবার শোনা গেল ফিলিপ কার্টারেটের গলা ৷

'সোহানার জন্যে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে লি-বিউসে প্রজেক্টে। ভিতরে থেকে কাজ করবে সোহানা। বহু কষ্টে অনুমতি আদায় করেছি। যাই হোক, ওর পক্ষে সবার ওপর চোখ রাখা আর খবরাখবর নেওয়া মোটেই কঠিন হবে না।

'তোমার জন্যেই প্যারিস থেকে ইন্সপেকশনে আসা সিনিয়র সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে লি-বিউসে প্রজেক্টে ঢুকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুনেছি ওখানকার সিকিউরিটি ব্যবস্থা এতই কড়া যে কোন পোকামাকড়ও কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া একেবারেই অসম্ভব। তোমাদের কবির চৌধুরী অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে দেখলাম। তাই তুমি একবার সিকিউরিটি ব্যবস্থাটা ভাল করে চেক করে দেখলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

'সব চীফ অভ স্টাফের সই করা অনুমতিপত্র আর আনুষঙ্গিক সব কিছু আমি পাঠিয়ে দেব ডুক্রেম ব্যুরোর নার্সিং হোমে। তুমি আগামীকাল সকালে ওখানে যখন ফাইনাল চেক আপের জন্যে যাবে তখন ওখান থেকে সংগ্রহ করে নেবে।

'লি-বিউসে প্রজেক্ট ইন্সপেক্ট করে বের হওয়ার পর দুজন লোক একটা কালো মার্সিডিস নিয়ে তোমার গাড়িকে ফলো করবে। তুমি সামনে পেট্রোল পাম্পে গিয়ে টয়লেটে তোমার কাপড়চোপড়, মুখোশ সব খুলে ফেলবে। মার্সিডিসের একজনও এসে ঢুকবে টয়লেটে। তোমার জামাকাপড়, মুখোশ ওকে দিয়ে ওরগুলো পরে নেবে তুমি। ও তোমার গাড়ি নিয়ে চলে যাবে। কালো গাড়িটা তোমাকে নিয়ে যাবে হায়ার্সে। সেখানে তোমার জন্যে একটা কেবিন ক্রুজার রি-মডেল করা হচ্ছে। কোটিপতি রবার্ট ক্রফোর্ডের পরিচয়ে তুমি তোমার অনুসন্ধানের কাজ চালাবে। রবার্ট ক্রফোর্ডের হবি হচ্ছে ফিশিং এবং স্কিন ডাইভিং। তোমার নতুন পরিচয়ের সব কাগজপত্রই তুমি রেডি পাবে ওখানে। গুডলাক, রানা।'

সেকেন্ড পাঁচেক চুপচাপ। তারপর খুট শব্দ হয়ে থেমে গেল টেপ। আবার টপ টোয়েন্টি চালু করে দিয়ে মুচকি হাসল রানা। এইবার নামতে হবে ওকে কাজে।

মুখটা শুকিয়ে গেছে সোহানার। সমাপ্তি ঘটতে চলেছে স্বপ্নের। এইবার ছাড়াছাড়ি।

'লি-বিউসে না গেলেই নয়? ওই গবেষণার সঙ্গে কবির চৌধুরীর কি সম্পর্ক?'

'কিছু একটা সম্পর্ক থাকতেও পারে। ট্রিসার মাধ্যমে। তোমার কাজ সেটা খুঁজে বের করা।'

'আর তোমার কাজ কবির চৌধুরীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নামা?'

'বুড়ো প্ল্যান প্রোগ্রাম কি ঠিক করেছে জানা গেল না টেপ থেকে। দেখা যাক, আগে কাজে তো নামি। তারপর দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।'

'আমার কেন জানি ভয় করছে, রানা। অমঙ্গলের চিন্তা আসতে চাইছে মনের মধ্যে।'

'তাড়িয়ে দাও।'

'যেতে চাইছে না।'

'এসো, আমি দূর করে দিচ্ছি।'
এক হ্যাঁচকা টানে রানার বুকের ওপর চলে এল সোহানা।
সাঁঝ হয়ে গেছে।
কেউ দেখতে পাচ্ছে না ওদের।

ছয়

'তিন নম্বর বোতামটা টিপলে সামনের ডেকটা একটু পেছন দিকে সরে যাবে আর...'

চারটে ·৫০ ক্যালিবারের ব্রাউনিং মেশিন গান দেখা দিল। নিঃশব্দে ডেকের ওপর বেরিয়ে এসেছে নলগুলো।

ফ্র্যাঙ্ক ডওসন গর্বের হাসি হাসল। সত্যিই অবাক হয়েছে রানা। রিমডেলিং বলতে যে ফিলিপ কার্টারেট এতটা বুঝিয়েছিলেন ধারণা করতে পারেনি রানা। চল্লিশ ফুট ডিলাক্স ক্রুজারের কন্ট্রোল ককপিটে দাঁড়িয়ে ফ্র্যাঙ্ক ডওসনের কাছ থেকে সব বুঝে নিচ্ছে সে।

'এগুলো একটা ইউনিট হিসেবে সব একসঙ্গেও চালানো যায়—কিংবা আলাদা আলাদাও চালানো যায়। অটোমেটিক অথবা হাতে চালানোর ব্যবস্থাও আছে। এই বোতামটা টিপলেই ব্রাউনিংগুলো কথা বলে উঠবে।' পাশের বোতামটা ছুঁয়ে দেখাল ফ্র্যাঙ্ক ডওসন। 'এক লাখ গুলি ফিট করা আছে রেডি অবস্থায়। তবে আপনার কাছে যে চাবিটা থাকবে সেটা দিয়ে এই সুইচটা অন না করলে এত সব গ্যাজেটের কিছুই কাজ করবে না। সুতরাং আপনার অনুপস্থিতিতে কেউ যদি এইসব বোতাম টিপেও দেয় ক্ষতির কিছু নেই। আর তারা কেউ অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করবে না, কারণ ডিলাক্স ক্রুজারে হাজারো রকম বোতাম থাকেই—আর তার মধ্যে কয়েকটা বোতাম নষ্ট থাকতেই পারে।'

রানাকে ইঞ্জিনের কাছে নিয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক। 'গুপ্ত এক্সট্রাগুলো ছাড়াও কিছু দামী এক্সট্রা রয়েছে যেগুলো লুকোবার দরকার পড়ে না। যেমন ডেকা নেভিগেটার আর ইকো-সাউন্ডার। এগুলো খুব কাজে আসবে অগভীর পানিতে চলার সময়ে।' রেডিও ট্র্যান্সমিটার সেটটার সামনে একটু থেমে একটা ছোট গর্ত দেখিয়ে বলল, 'এইখানে চাবিটা লাগালে অস্কার জনসন সেট চালু হয়ে যাবে। সরাসরি ডুক্সেম ব্যুরোর হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।'

একটা হ্যাচ খুলে দেখাল ফ্র্যাঙ্ক। টুইন ক্রাইসলার ১৭৭ এস ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছে। চল্লিশ ফুট ক্রুজারের জন্যে এটাই স্ট্যান্ডার্ড। কিন্তু একটু নজর করে দেখলে দেখা যাবে এরই নিচে রয়েছে একটা ওয়েস্টিংহাউস জে ৪৬ ডাবলিউ

ই-৮বি টারবো জেট। পাঁচহাজার হর্সপাওয়ার চাপ সৃষ্টি করতে পারে ওই ইঞ্জিন—অর্থাৎ প্রায় ১৩৫ মাইল বেগে ছুটবে এই ক্রুজার! আসুন, ওটা চালু করার বোতামটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে কনট্রোল ককপিটে।' আবার ফিরে এল ওরা ককপিটে।

'ওটা চালু করার আগে এই বোতামটা টিপে নিতে হবে মনে করে। নইলে ১৩৫ মাইল বেগে নির্ঘাত ডিগবাজি খেয়ে উল্টে যাবে ক্রুজার। এই বোতাম টিপলে ক্রুজার পানির ওপরে উঠে যাবে। চারটে ফয়েলের ওপর থাকবে ক্রুজার আর সেই সঙ্গে স্টেবিলাইজার ফিন্‌গুলোর কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে।'

'চমৎকার ফ্র্যাঙ্ক,—ওয়েল ডান।' সত্যিই চমৎকৃত হয়েছে রানা। এত কম সময়ে এত কিছু করা চাট্টিখানি কথা নয়।

'আমার কাজে আপনি খুশি হয়েছেন জেনে খুব আনন্দিত বোধ করছি। খুব খাটুনি গেছে আমার—কিন্তু খাটুনিটা সার্থক হয়েছে। আমার ফাইনাল টাচের কথা এখনও আপনাকে জানানো হয়নি কিন্তু। কেউ ধাওয়া করলে তাকে নিরুৎসাহ করার জন্যে দুটো ৪০ মিলিমিটার বোফার ফিট করা হয়েছে ক্রুজারের পিছন দিকে। পানির দেড় হাত ওপর দিয়ে গোলাগুলো যাবে এই বোতাম টিপলে। সেই সঙ্গে এই বোতামটা টিপলে ছোট ছোট অনেকগুলো ম্যাগনেশিয়াম চার্জ ফিশিং চেয়ারের নিচে থেকে ছুটে গিয়ে পড়বে পানিতে। শত্রুপক্ষের বোটের সঙ্গে ধাক্কা খেলেই সেগুলো ফেটে গিয়ে ফাঁৎ করে জ্বলে উঠবে। সেই সঙ্গে বিস্ফোরণ।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে 'মোবাইল গার্ল' টুলনের দিকে। হায়ার্স থেকে টুলনের পথে হাতটাকে বেশ পাকিয়ে নিয়েছে রানা। চাবি ঘুরিয়ে স্টেবিলাইজার বোতাম টিপে ফুল স্পীডে চালিয়েও দেখেছে একবার—১৩৩ মাইল স্পীড ওঠে ফুল থ্রটলে। একেবারে হাওয়ায় উড়ছে মনে হয়।

কেপ সিসি দেখা যাচ্ছে। ওটা ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এগোলেই বেগ সিটি। দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় ঘেঁষে অ্যাকোয়াসিটি তৈরি করছে মাহমুদ বেগ। সেদিন ক্যাপ্টেন সন্ডার্স কিছুতেই ওকে এদিকে নিয়ে আসতে রাজি হয়নি। একটু ঘুরে দেখে যাওয়াই স্থির করল সে। বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিং হুইল। তীর থেকে আড়াই মাইল দূর দিয়ে তীরের সাথে সমান্তরাল ভাবে ১৭৫ ডিগ্রী কোর্সে চলল রানা। দূরবীনটা হাতে নিয়ে তীরের দিকে ফোকাস করল। মাহমুদ বেগের বিরাট ভিলাটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতদূর থেকে ঠাহর করা যাচ্ছে না ভালমত। ভাল করে দেখতে হলে আর একটু কাছে যাওয়া দরকার। কোর্স বদলে রানা ১৬৫ ডিগ্রীতে নিল পাড়ের আর একটু কাছে যাবার জন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেডিও কড় কড় শব্দ করে উঠল। একটা ধাতব কণ্ঠে শোনা গেল, 'পি কে—তিন দুই নয় তিন··· পি কে··· তিন দুই নয় তিন···তুমি নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ছ—শুনতে পাচ্ছ? পি কে—৩২৯৩

'মোবাইল গার্ল,' তুমি নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ছ—কোর্স বদল করে আরও দক্ষিণে নাও।'

এতদূর থেকে নাম আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পড়তে পারছে অনায়াসে। খুবই শক্তিশালী দূরবীন ব্যবহার করছে ওরা। খুব সতর্কও বটে—কোর্স বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলেছে। কোর্স বদলে আবার ১৭৫ ডিগ্রীতে নিয়ে গেল রানা।

রেডিওতে আবার শোনা গেল, 'পি কে—৩২৯৩, নিষিদ্ধ এলাকায় অসাবধানে ঢুকে পড়ার জন্যে, আর রেডিও মেসেজের জবাব না দেয়ার জন্যে ফ্রেঞ্চ শিপার্স ফেডারেশনে তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা হবে। ওভার।'

এবারেও রানা কোন জবাব দিল না। রানার মাথায় চিন্তা চলেছে দ্রুত। ওই জায়গায় ঢুকতে হলে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু ওখানে ঢুকতে ওকে হবেই। যেভাবেই হোক।

বড় একটা চক্কর দিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে টুলনে পৌঁছল রানা। সি-ভিউ হোটেলে আগে থেকেই রুম বুক করা হয়েছে রবার্ট ক্রফোর্ডের জন্যে। নোঙর ফেলে জাহাজ বাঁধার দড়িটা ছুঁড়ে দিল রানা জেটি, অ্যাটেন্ডেন্টের দিকে। সি-ভিউ হোটেলের নিজস্ব জেটি এটা। পাঁচ-ছ'টা ইয়ট ভেড়বার জায়গা রয়েছে এখানে।

'আপনি নিশ্চয়ই মশিয়ে ক্রফোর্ড? আগেই খবর পেয়েছি আমরা—হায়ার্স থেকে আসছেন তো? আপনার...'

ছোট্ট একটা 'হুঁ' দিয়ে থামিয়ে দিল রানা ওকে। টেলিফোনে রিসেপশনে খবর দেওয়ার আধ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল দু'জন হোটেলের ইউনিফর্ম পরা লোক ছুটতে ছুটতে আসছে মালপত্র নামাতে; পেছনে ম্যানেজার স্বয়ং আসছে হন্তদন্ত হয়ে।

বিরাট ধনী হওয়ার অনেক সুবিধা আছে। ক্রফোর্ড হলে তো কথাই নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সের নাম করা জাহাজ নির্মাতা পরিবার এরা মূলত ব্রিটিশ হলেও এখন এরা ফ্রেঞ্চ হয়ে গেছে পুরোপুরি।

ম্যানেজার এসে নিজে তদারক করে রুম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল রানাকে। হোটেল রেজিস্টারে সই করারও দরকার মনে করল না ম্যানেজার—পাছে অতিথির কষ্ট হয়।

স্নান সেরে টেলিফোনে রুম সার্ভিসে খাবার অর্ডার দিল রানা। সঙ্গে সাপ্তাহিক আর দৈনিক কাগজগুলোও পাঠাতে বলল। খেতে খেতে কাগজের প্রতিটা লাইন পড়েও এডি মরক্যান, ফ্রান্সেসকো, ক্যাপ্টেন সভার্স বা তার নিজের নিরুদ্দেশ হবার কোন খবর না দেখে অবাক হলো সে। সন্ধ্যার সময়ে বার-ডি রিগাল-এ গেল রানা। হয়তো ট্রিসার সাথে দেখা হবে, এই আশায়। কিন্তু রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন ট্রিসার দেখা পেল না তখন শেষ পর্যন্ত বোরবোনের অর্ডার দিল। বারম্যান ড্রিঙ্কটা ট্রে থেকে টেবিলে

নামিয়ে রাখতে রানা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন সভার্সকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো? শুনেছি সে নাকি ফিশিং-এর ব্যাপারে এই অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল গাইড?'

রানার চোখে চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বারম্যান জবাব দিল, 'আপনার বুঝি ফিশিং-এর খুব শখ? কিন্তু ওই নামের কোন ক্যাপ্টেনের কথা তো শুনিনি কোনদিন, মশিয়ে। আপনাকে কেউ ভুল খবর দিয়েছে।' ডাহা মিথ্যা কথাটা বলে আর একজনের ডাকে চলে গেল বারম্যান।

নিজের হোটেল কামরায় ফিরে এল রানা। গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। কিছুতেই উপায় খুঁজে পাচ্ছে না সে সামনে এগুবার। অনেক চেষ্টায় যেটুকু জানতে পেরেছিল সেটা আর এখন কাজে লাগছে না। ক্যাপ্টেন সভার্স আর ফ্রান্সেসকো মৃত—হয়তো এডি মরগ্যানের অবস্থাও তাই। ট্রিসার দেখা নেই—তবে ট্রিসার সাথে দেখা হলেও ওর কাছ থেকে কতটুকু তথ্য বের করা যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে রানার। নতুন কোন লাইনে অনুসন্ধান চালাতে হবে। ঠিক করল পরদিন প্রফেসার ব্র্যাভের সাথে দেখা করতে হবে। মনে মনে একটা খসড়া প্ল্যান তৈরি করে ঘুমিয়ে পড়ল সে রবার্ট ক্রফোর্ডের জন্য পাতা পরিপাটি বিছানায়।

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই 'মোবাইল গার্ল'-এ গিয়ে উঠল রানা। পিয়ার অ্যাটেন্ডেন্টকে বলল সারা দিনের জন্যে ফিশিং-এ যাচ্ছে সে। ক্রুজারে টিনের খাবার যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও হোটেল থেকে টাটকা খাবার আনিয়ে ফ্রিজ ভরিয়ে নিল। যদিও অনেক উন্নতি সাধন করেছে ফুড রিসার্চ বৈজ্ঞানিকরা, তবু ঠিক সেই তৃপ্তিটা পায় না রানা টিনের খাবারে।

ক্রুজারটা সমুদ্রের ভিতর মাইল দু'য়েক নিয়ে গিয়ে [illegible]কার জনসন ট্র্যান্সমিটারটা চালু করল সে স্পেশাল চাবি ঘুরিয়ে। পিটার গিলের সাথে কথা বলল পাঁচ মিনিট ধরে। ঠিক হলো রানার কথা মত সব জিনিস জোগাড় করে ঠিক বিকেল চারটের সময়ে 'সি-ভিউ' পিয়ার থেকে দুই মাইল পুবে নির্জন এক বীচে দেখা করবে পিটার গিল ওর সঙ্গে। সারাটা দিন দেখা গেল রবার্ট ক্রফোর্ডকে সমুদ্রের নানান জায়গায় নোঙর ফেলে মাছ ধরছে। কখনও গভীর জলে, কখনও একেবারে তীরের কাছে। ইকো সাউন্ডার ব্যবহার করে নির্ভয়ে যতদূর সম্ভব পাড়ের কাছে চলে আসতে পারছে সে। ঠিক বিকেল চারটের সময়ে সাঁতরে গিয়ে উঠল রানা পাড়ে। ক্রুজার থেকেই লক্ষ্য করছে সে পিটার গিলের আগমন। একটা ওয়াটার-প্রুফ পোটলা রানাকে এগিয়ে দিয়ে পিটার বলল, 'এর মধ্যে যা যা চেয়েছিলেন সবই পাবেন। বছর দশেক আগে সমুদ্র বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটে ডক্টর নিমেরী ফ্লেচার আর প্রফেসার ব্র্যাভ একসঙ্গে কাজ করেন। ওঁরা দু'জন মিলে মিনি-সাবমেরিনের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। প্রায় তিন বছর একসঙ্গে কাজ করেন দুই বৈজ্ঞানিক। ডক্টর ফ্লেচারের একসেট ব্যবহার করা কাপড় আনানো হয়েছে ভ্যালেন্স থেকে। রবারের মুখোশ, গ্লাভস

ইত্যাদিও আছে ওই পোঁটলার মধ্যে।'

'ধন্যবাদ। এখন সময় নেই। পরে কথা হবে।' রওনা দিল রানা আবার ক্রুজারের দিকে। একটু পরেই বেগ সিটির দিকে চলল কেবিন ক্রুজার। পোঁটলাটা খুলে একবার চেক করে নিল রানা ভিতরের জিনিসগুলো। তারপর বেগ সিটির ম্যাপটা মুখস্থ করে ফেলল সে পাঁচ মিনিটে। তীর থেকে সিকি মাইল দূরে নোঙর ফেলল রানা। দূরবীন দিয়ে আশেপাশে ভাল করে দেখে নিল। এদিকটা জনমানব শূন্য। ডান দিকে একটা পরিত্যক্ত বোট হাউস দেখা যাচ্ছে। আর সময় নষ্ট না করে সমুদ্রের দিক দিয়ে একটা দড়ি ঝুলিয়ে নেমে পড়ল সে পানিতে। তীরের দিক দিয়ে নামতে গেলে কারও চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পোঁটলা হাতে বোট হাউসে গিয়ে উঠল রানা। পাঁচমিনিট পরে বোট হাউস থেকে বেরিয়ে এল ডক্টর নিমেরী ফ্লেচার। দেখেই বোঝা যায় নিজের প্রতি কোন খেয়াল নেই ভদ্রলোকের। চোখে রিমলেস চশমা—পরনে সেকেলে ঢোলা স্যুট। বয়স পঞ্চাশের ওপরে হবে।

এতসব কাণ্ড না করে সোজাসুজি একটা গাড়ি নিয়ে হাজির হতে পারত সে প্রফেসার ব্র্যান্ডের সাথে দেখা করবার জন্যে। কিন্তু রানার ধারণা নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে প্রফেসারকে। হঠাৎ গিয়ে হাজির হতে পারলেই কার্যসিদ্ধ হতে পারে। গাড়িতে গেলে বেগ সিটিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হয়ে যাবে ওরা। দেখা করা আর সম্ভব হবে না কোন মতেই। কাউকে জিজ্ঞেস না করেই যেন প্রফেসারের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে সেজন্যে আগেই সে ভাল করে ম্যাপটা দেখে নিয়েছে। দ্রুত পা চালাল। ভাগ্য ভাল যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাপটা দেখেছিল রানা, নইলে সারি সারি একই রকম বাড়ি আর একই রকম রাস্তার মধ্যে থেকে ঠিক বাড়িটা চিনে বের করা সোজা কাজ হত না।

হাঁটতে হাঁটতেই লক্ষ করল রানা যে এই এলাকার সব বাসিন্দাই হয় বুড়ো নয়তো বুড়ি। একটা ছোট বাচ্চাও নজরে পড়ল না ওর। বুড়ো-বুড়িরা কেউ বাগানে পানি দিচ্ছে, কেউ বা রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে বিকেলের রোদ পোহাচ্ছে।

দরজার বেল বাজাতেই ভোঁতা চেহারার একটা লোক দরজা খুলল। ডক্টর নিমেরী ফ্লেচার লেখা কার্ডটা হাতে নিয়ে একটু পরীক্ষা করে দেখে আবার সে রানার হাতে সেটা ফিরিয়ে দিয়েই দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। বেগতিক দেখে রানা চট করে পা বাধিয়ে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা বিফল করে দিল। 'অনেক পুরানো বন্ধু আমরা...' বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভোঁতা চেহারার লোকটা সামলে উঠবার আগেই হল পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল রানা। 'এই যে প্রফেসার ব্র্যান্ড—আপনিই বলে দিন ওকে আমরা পুরানো বন্ধু কি না?' হুইল চেয়ারে বসা পাতলা ছোট্ট লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল রানা।

ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল প্রফেসার ব্র্যান্ডের—ক্ষীণ কণ্ঠে শোনা গেল, 'হ্যাঁ, পুরানো বন্ধু। কতদিন পরে দেখা—কেমন আছ তুমি—ইন্সটিটিউটের খবর কি? আমাদের সেই মিনিসাবমেরিন কেমন চলছে…' উত্তেজিত হয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে করে বসলেন প্রফেসার ব্র্যান্ড। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, দরজার দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন।

দরজার দিকে চেয়ে দেখল রানা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে ডক্টর জিমি ক্রিদারো।

'এভাবে জোর করে ঘরে ঢুকে পড়ার কি মানে?' চোখ গরম করে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল জিমি।

রানা কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে জিমি ক্রিদারো বলল, 'আপনি কি জানেন না প্রফেসার ব্র্যান্ড খুবই অসুস্থ? এই কিছুদিন আগেই সিরিয়াস হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল?'

'আমার স্ট্রোক হয়েছিল। বছর খানেক আগে একবার, তারপর কয়েক মাস আগে আবার।' মুখস্থ বলার মত আউড়ে গেলেন প্রফেসার।

অবাক হয়ে প্রফেসারের দিকে চেয়ে রইল রানা কয়েক সেকেন্ড। বলার ভঙ্গিতে কেমন যেন খটকা লাগল রানার। বলল, 'এসব কথা আমার জানা ছিল না। আমি এসেছিলাম একটা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে। ওঁর মতামত জানা ছাড়া…'

'আলোচনা চিঠির মাধ্যমে সারলেই ভাল হত না? এখানে আসার কি দরকার ছিল? প্রফেসারের জন্যে সব রকম উত্তেজনাই খুব খারাপ। ওঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে বলছি, আপনি এখন আসুন।' কথা শেষ করেই জিমি আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার গাড়ি কি বাইরে?'

'না, আমি ট্যাক্সিতে এসেছি।' জবাব দিল রানা।

সেই ভোঁতা চেহারার লোকটাও এসে দাঁড়িয়েছে ভিতরে। রানার জবাব শুনেই কনুই দিয়ে ছোট্ট একটা গুঁতো মারল সে জিমিকে।

'কই কোন গাড়ির শব্দ তো পাইনি আমি?' প্রশ্ন করল জিমি।

'এখানকার সব বাড়ি একই রকম। ভুল করে আমি সি ব্লকে নেমে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওখান থেকে এই পর্যন্ত হেঁটেই এসেছি।'

ভোঁতা চেহারার লোকটা এবার রানার পাশ দিয়ে গিয়ে প্রফেসারের হুইল চেয়ার ঠেলে ভিতরে অন্য ঘরে নিয়ে গেল। প্রফেসার কোন প্রতিবাদ করলেন না।

'দাঁড়াও, অন্তত প্রফেসারের কাছ থেকে বিদায় নিতে দাও আমায়?'

ভদ্র অথচ শক্ত হাতে বাহু চেপে ধরে দরজার দিকে নিয়ে গেল জিমি রানাকে, 'কোন লাভ নেই। দেখলেন তো—এরই মধ্যে ভুলে গেছেন উনি আপনাকে। সব সময়ে এখন আর উনি প্রকৃতিস্থ থাকেন না।' বলতে বলতে দরজা খুলে রানাকে প্রায় একরকম ধাক্কা দিয়েই বের করে দরজা বন্ধ করে

দিল জিমি।

চ্যা, এ্যা এ্যা শব্দ তুলে থামল গাড়িটা। বিকিনি পরা ট্রিসা নেমে এল ড্রাইভিং সীট থেকে।

'ডক্টর ফ্রেচার না? অনেক দিন পরে দেখা। কি ব্যাপার?'

'এই তো। এসেছিলাম আপনার বাবার সঙ্গে একটা জরুরী সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে। আপনার খবর কি?'

আলাপ জমাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সে সবের ধার দিয়েই গেল না ট্রিসা। সামান্য একটু মামুলি আলাপ করেই বলল, 'মাপ করবেন, স্নান সেরে এলাম—এই ভিজে কাপড় না ছাড়লে শেষে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।' বলেই পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। রানা আশা করেছিল ট্রিসা হয়তো তাকে ভিতরে নিয়ে যাবে, কিন্তু সে আশা আশাই রয়ে গেল। ফেরার জন্যে হাঁটতে আরম্ভ করল সে। ভাবতে ভাবতে চলেছে রানা—কোথায় যেন কি একটা গোলমাল চোখে পড়েছে ওর। চোখে পড়েছে, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে ধরতে পারেনি সে এখনও ব্যাপারটা। সূক্ষ্ম কিছু। এতই আবছা যে স্পষ্ট করে তোলা যাচ্ছে না সহজে। আসছে, আসছে—আসছে না। ছোটখাট জিনিসও সহজে রানার নজর এড়ায় না বলে অনেকবার অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে সে। কিন্তু আজ এরকম হচ্ছে কেন? ট্রিসার ব্যবহৃত সুগন্ধি, চুলের স্টাইল বা কথা বলার ভঙ্গি, কোন্‌টা একটু অদ্ভুত ঠেকল রানার কাছে?

দুটো ব্লক পার হয়ে এসেছে রানা। ঘাড়ের চুলের কাছে কেমন একটা শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে। সারা বেগ সিটির আবহাওয়াটাই হঠাৎ পাল্টে গিয়ে কেমন যেন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে।

চলার গতি সমান রেখে যেদিকে চলছিল সেইদিকেই চলতে থাকল রানা। আপন ভোলা বৈজ্ঞানিকের চলন যেমন হয় ঠিক তেমনি ভাবে। কিন্তু প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতর্ক হয়ে রইল বিপদের লক্ষণ দেখলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে।

তৃতীয় ব্লকটা পার হয়েই চলার গতি বাড়াল রানা। জনা কয়েক বুড়ো লোক একত্র হয়ে গল্প করছে। ওদের পেরিয়ে যেতে যেতে রানা শুনল স্টক মার্কেট সম্বন্ধে আলোচনা করছে ওরা। আর একটু এগিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে চাইল সে। দেখল ওদের মধ্যে দু'জন গল্প ছেড়ে রানার পিছু পিছু আসছে রাস্তার ওধারের ফুটপাথ দিয়ে। রানা অবাক হয়ে লক্ষ করল বুড়ো হলেও ওদের চলার ভঙ্গি খুবই দ্রুত—তাতে বয়সের কোন ছাপ নেই। চলার গতি আরও বাড়াল রানা। চোখের কোণে লক্ষ করল চলার গতি বেড়ে গেল ওদেরও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সামনে আরও কয়েকজন বুড়োকে দেখা যাচ্ছে। দু'জন তিনজনের ছোট ছোট কয়েকটা গ্রুপ। বৈকালিক গল্প গুজব করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এক নজরেই রানা বুঝে নিল, ব্যাটাদের মতলব

ভাল না। একদল থেকে আরেক দলের ব্যবধান পঞ্চাশ গজ মত হবে। দুটো ফুটপাথই কাভার করছে ওরা।

চিন্তা করার আর সময় নেই। ঝেড়ে দৌড় দিল রানা বাঁ দিকের বাড়িটার ড্রাইভ-ওয়ে ধরে। রাস্তায় লোকজনদের চিৎকার আর জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। পিছু ধাওয়া করেছে ওরা। গ্যারেজটার পাশ দিয়ে দেয়াল টপকে ওপাশের বাড়ির বাগানে পড়ল রানা। এক বুড়ি বাগানে গাছের গোড়া খোঁচাচ্ছিল খুপরি দিয়ে। রানাকে হঠাৎ আকাশ থেকে পড়তে দেখে ভয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। ভয় পেয়েছিস, একবার চিৎকার করে উঠে থেমে যা—তা না, সাইরেনের মত চিৎকার দিয়েই চলল বুড়ি। রানা যে কোথায় আছে জানতে কারও বাকি থাকবে না চিৎকারের ঠেলায়। বুড়ির গলাটা টিপে দেয়ার ইচ্ছে বহুকষ্টে দমন করে দ্রুত দেয়াল টপকাল সে। বাজে সময় নষ্ট করলেই ধরা পড়ে যাবে ও। পর পর চার পাঁচটা দেয়াল টপকাল সে। একটা সরু গলিপথ পাওয়া গেল। গতিপথ ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল রানা। শেষ মাথায় গিয়ে একটা রাস্তা পার হয়ে আরও কয়েকটা দেয়াল টপকাল। কাউকেই চোখে পড়ল না। এভিনিউ থ্রীতে এসে আবার হাঁটা আরম্ভ করল রানা। যারা তাড়া করছিল তাদের অনেক পেছনে ফেলে এসেছে সে। বেগ সিটির প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে এখন। আর আধ মাইল যেতে পারলেই বোট-হাউসে পৌঁছানো যাবে।

চলতে চলতে অনেক চিন্তা ভিড় করে আসছে রানার মনে। দিনের আলোয় প্রকাশ্যে এভাবে তাড়া করার সাহস কি করে পেল ওরা? তবে কি বেগ সিটির সবাই ওদেরই লোক? ইশ্, একেবারে বাঘের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে আবার বেরিয়ে এসেছে সে। কিন্তু যখন সুযোগ ছিল, প্রফেসার ব্র্যান্ডের বাড়ির মধ্যেই তো জিমি আর সেই ভোঁতা চেহারার লোকটা আটক করতে পারত তাকে। তবে রাস্তার মধ্যে এভাবে তাড়া করার মানে কি? নিশ্চয়ই প্রফেসার ব্র্যান্ডের বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নামার পর ওরা তাকে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ কি? ট্রিসা ডক্টর ফ্লেচারকে চেনে—সেই কি ধরে ফেলল যে রানা ফ্লেচার নয়? প্রফেসার ব্র্যান্ডের মুখস্থ বলার ভঙ্গিটা ভাল লাগেনি রানার। ব্রেইন-ওয়াশ কেস অনেক দেখেছে রানা। তোতা পাখির মত যা শেখানো হয় তাই মুখস্থ বলে যায় ওরা। প্রফেসার ব্র্যান্ডকে কি ব্রেইন-ওয়াশ করা হয়েছে?

একটা গাড়ির শব্দে পিছন ফিরে চাইল রানা। ডান হাত চলে এল তার প্রিয় ওয়ালথার পি. পি, কে-র বাঁটে। গাড়িটা থামল এসে রানার সামনে। চার্চের ক্লার্জিম্যানের পোশাক পরা এক ভদ্রলোক আকর্ণ হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই তো প্রফেসার ব্র্যান্ডের বন্ধু—তাই না? আমি বেগ সিটি চ্যাপেলের ক্লার্জিম্যান রেভারেন্ড লিগুরী।' কোন জবাব না দিয়ে সতর্ক চোখে তাকাল রানা লোকটার ওপর।

'দেখলাম আপনি প্রফেসার ব্র্যান্ডের বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন। সাথে গাড়ি

নেই। আমি টুলন যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। গাড়ি বের করে আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এলাম। ভাবলাম আপনাকে পেলে লিফট দেব। আপনিও লিফট পাবেন, আমিও বেশ গল্প করতে করতে যেতে পারব। একা ড্রাইভ করতে আমার মোটেও ভাল লাগে না।' রানার সন্দিগ্ধ চোখের দিকে চেয়েই এতটা ব্যাখ্যা দিল রেভারেন্ড লিগুরী।

রেভারেন্ডের একটা কথাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না রানার। প্রফেসার ব্র্যান্ডের বাড়ি থেকে তাকে যদি বের হতে দেখেও থাকে রেভারেন্ড লিগুরী, ডক্টর ফ্লেচারের বেশধারী রানা যে প্রফেসার ব্র্যান্ডের বন্ধুই, এ বিষয়ে নিশ্চিত হলো কি করে সে? আন্দাজে? আন্দাজে এত সঠিক ধারণা করে ফেলাটা ভাল লাগল না ওর কাছে। এটা একটা ফাঁদও হতে পারে।

'কোন অসুবিধার মধ্যে পড়েননি তো আপনি?'

আবার বলল রেভারেন্ড। চোখে মুখে তার আন্তরিক উৎকণ্ঠার ছাপ। 'আমি দেখলাম প্রফেসারের বাড়ির আশেপাশে কিছু লোক ছুটোছুটি করছে। প্রফেসার ব্র্যান্ড আবার অসুস্থ হয়ে পড়েননি তো? গত স্ট্রোকের পরে আমি দেখতে গিয়েছিলাম—কিন্তু ওই অদ্ভুত স্বভাবের ডাক্তারটা দেখা করতে না দিয়েই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।'

রেভারেন্ডের মাথার ওপরকার রিয়ার ভিউ-মিররে চোখ পড়তেই পেছন ফিরে চাইল রানা। দূরে রাস্তার মাথায় দেখা যাচ্ছে কালো চশমা আর ফুল-পাতা ডিজাইনের শার্ট পরা দু'জন লোক ছুটে আসছে। চিনতে দেরি হলো না রানার—এরা দু'জনই পিছু নিয়েছিল প্রথমে।

'আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?' আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল রেভারেন্ড লিগুরী।

কিন্তু ততক্ষণে দৌড়াতে শুরু করে দিয়েছে রানা। কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে দেয়ালে লাগল। প্রতিপক্ষ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। প্রকাশ্যে দিনের আলোয় রাস্তার ওপর গুলি করে রানাকে হত্যা করবার হুকুম দেয়া হয়েছে ওদের। নিমেষে ওয়ালথার পি. পি. কে বেরিয়ে এল ওর হাতে। এঁকে বেঁকে দৌড়াচ্ছে ও এখন মাথা নিচু করে। আরেকটা গুলির শব্দ হলো। এবারের গুলিটা রানার বাঁ পাশে রাস্তার কিছুটা অংশ ছিন্নভিন্ন করে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়েই পরপর দু'বার গুলি করল রানা। যারা ধাওয়া করছিল তাদের একজন চিৎকার করে এক পাক ঘুরে পড়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা লেগেছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। অন্যজন লাফ দিয়ে একটা দেয়ালের পিছনে আশ্রয় নিল। এই সুযোগে আবার দৌড় দিল রানা।

বেগ সিটি সীমানার বাইরে চলে এসেছে সে। আর দুশো গজ যেতে পারলেই সমুদ্রের ধারে পৌঁছে যাবে। অসংখ্য বড় বড় পাথর ছিটিয়ে রয়েছে ওখানে। এই কারণেই সাঁতার কাটার জন্যে কেউ আসে না এদিকটায়। দুশো গজ পার হতে পারলেই আর চিন্তা নেই। পাথরগুলোই তখন গুলি ঠেকাবে।

পিছন ফিরে একবার দেখে নিল রানা—আরও দু'জন যোগ হয়েছে। মোট তিনজন এখন আসছে ওর পেছনে। হঠাৎ সামনের মোটা লোকটা পাতলা হয়ে গেল। ভুঁড়িটা চলে এসেছে ওর হাতে। চাদরের মোড়কটা ফেলে দিতেই দেখা গেল ওর হাতে একটা কালো সাব-মেশিনগান! ছুটতে ছুটতেই ডাইভ দিল রানা। দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে সাব-মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। গুলিবর্ষণ আরম্ভ হলো। কনুই দিয়ে ক্রল করে ডাইনে সরে গেল রানা বালির ঢিবিটার আড়ালে। বালির ঢিবির ওপরই গুলি বর্ষণ হলো কিছুক্ষণ। কেঁপে কেঁপে উঠছে এক একটা গুলির আঘাতে, সেই সঙ্গে বালি আর পাথর ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে রানার মাথার ওপর দিয়ে। গুলি থামতেই মাথাটা একটু উঁচু করে দেখল রানা অনেকদূর এগিয়ে এসেছে ওরা তিনজন। মাঝের লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাঁকা ম্যাগাজিনটা বের করে গুলিভর্তি আরেকটা ম্যাগাজিন ঢোকাচ্ছে সেই জায়গায়। গর্জে উঠল রানার ওয়ালথার। মুহূর্তে বিকৃত হয়ে গেল লোকটার মুখ। হাত থেকে সাব-মেশিনগানটা পড়ে গেল মাটিতে। ওটার ওপরই মুখ থুবড়ে পড়ল সে। গুলি করেই একছুটে প্রথম বড় পাথরটার আড়ালে চলে গেল রানা। বাঁ দিকের লোকটার গুলি এসে লাগল পাথরটার গায়ে। রানার ছেড়ে আসা বালির ঢিবিটার আড়ালে আশ্রয় নেবার জন্যে ছুটেছে লোকটা। চলন্ত টার্গেট। একটু সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপল রানা। অব্যর্থ লক্ষ্য। বুক ভেদ করে চলে গেছে গুলিটা। সঙ্গী দু'জনের অবস্থা দেখে তৃতীয় জন আর রানার পেছনে ধাওয়া করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল না। ভীত খরগোশের মত লাফানোর ভঙ্গিতে দৌড় দিল উল্টো দিকে। লক্ষ্য স্থির করেছিল রানা কিন্তু হাতটা নামিয়ে নিল আবার। পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীকে হত্যা করবার কোন অর্থ হয় না। একটু আগে ও রানাকে মারার জন্যেই এসেছিল বটে, কিন্তু ওর দৌড়ের বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে বর্তমানে সে রকম ইচ্ছে আর ওর নেই।

এগিয়ে গিয়ে দেহ দুটো পরীক্ষা করল রানা। দু'জনই মৃত। ওদের মুখে কোন মুখোশ নেই দেখে একটু অবাক হলো রানা। একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেই বুঝল প্লাস্টিক সার্জারির কাজ। দাগ রয়েছে কপালের ওপরে চুলের নিচে ঢাকা। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে কোঁচকানো হয়েছে ওদের চামড়া। সাব-মেশিনগানটা হাতে নিয়ে দেখল, রাশিয়ান অস্ত্র। কিন্তু অরিজিনাল নয়। সম্ভবত ওটা ইসরাইলী ইমিটেশন। মাহমুদ বেগও তো ইহুদী? ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই এই অস্ত্র সিভিলিয়ান কাউকে রাখার অনুমতি মঞ্জুর করেনি। স্মাগলড্ হয়ে এসেছে এটা।

আপাতত আর কিছুই করবার নেই রানার। বোট হাউসে ফিরতে হবে। দিন দুপুরে তিন তিনটা খুনের সঙ্গে রবার্ট ক্রফোর্ড-এর কোন যোগাযোগ আছে সেটা কারও না জানাই ভাল। বালিতে পায়ের ছাপ দেখে যেন কেউ বুঝতে না পারে রানা কোন্ দিকে গেছে। সেজন্যে বার কয়েক পানির ধার পর্যন্ত গেল

আবার ফিরে এল। সাতবারের মাথায় দেখা গেল যে বালিতে তার পায়ের ছাপ একটার ওপর একটা এমন ভাবে পড়েছে যে সে ক'বার পানির ধারে গেছে আর ক'বার ফিরে এসেছে তা কোন ফুটপ্রিন্ট এক্সপার্টেরও বোঝার সাধ্য নেই! এবারে পানিতে নামল রানা। জুতো জোড়া খুলে হাতে নিয়ে হাঁটু পানিতে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলো সে বোট হাউসের কাছে। খালি পায়ে আলতো ভাবে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে ঢুকল বোট হাউসে। সন্ধে হয়ে এসেছে। আশপাশটা ভাল করে দেখে নিয়েছে সে বোট হাউসে ঢুকবার আগেই—কেউ কোথাও নেই। ভিতরে ঢুকে তার ফেলে যাওয়া জিনিস-পত্রগুলো পরীক্ষা করে বুঝল যে তার অনুপস্থিতিতেও কেউ ঢোকেনি সেখানে। ডক্টর নিমেরী ফ্লেচারকে ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে ভরে ফেলল রানা। ওয়ালথার পি. পি. কেও রেখে দিল ওই সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে। বাঁ হাতের সঙ্গে বাঁধা পেন্সিলের মত দেখতে একটা খাপে পোরা বিশেষ ভাবে তৈরি স্টিলেটোটা আর ব্যাগে ভরল না রানা। সমুদ্রের এদিকটায় হাঙর বাবাজীদের আনা-গোনা আছে কিনা সঠিক জানা নেই। কিছু একটা অস্ত্র সঙ্গে থাকা ভাল। জিনিসটা ফ্র্যাঙ্ক ডওসনের উপহার। খুব পছন্দ হয়েছে রানার। গোড়াটা সিকি ইঞ্চি মোটা। ধরার সুবিধের জন্যে ছোরার মত বাঁট। ফলাটা সাড়ে সাত ইঞ্চি লম্বা। গোড়ার দিকটা একেবারে গোল। আস্তে আস্তে চোখা হতে হতে শেষ মাথা একেবারে সূচের মত তীক্ষ্ণ। শেষের দিকের অর্ধেকটা অংশ আবার ক্ষুরের মত ধারাল। ছুরির কাজও চলে ওটা দিয়ে। খুবই শক্ত স্পেশাল ইস্পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। চমৎকার জিনিস।

বোট হাউস থেকে বেরিয়েই মানুষের উপস্থিতি টের পেল রানা। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। বিশাল চেহারার লোকটা উঁচু পাথরটা থেকে লাফিয়ে পড়েছে রানার ওপর। নিমেষে দেখে নিল রানা লোকটার পেছনে আরও একজন রয়েছে। দু'জনকেই চিনতে পারল সে। এরা পিছু নিয়েছিল প্রফেসর ব্র্যান্ডের বাড়ি থেকে বেরোবার খানিক পরেই। মাঝে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওরা চিনল কি করে? এখন তো সে রবার্ট ক্রফোর্ড। তবু কি করে চিনল? পড়ে গেল দু'জনেই বালির ওপর। ইস্পাতের টুকরোটা চলে এসেছে রানার হাতে। চিনে যখন ফেলেছে এদের দু'জনকে আর বেঁচে থাকতে দেয়া চলে না। ভয়ঙ্কর লোকের বিরুদ্ধে নেমেছে সে। জয়ী হতে হলে তাকেও নির্দয় হতে হবে বৈকি। জুডোর কায়দায় রোল করে উঠে দাঁড়াল রানা। আক্রমণকারীও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েই মারল রানার পাঁজরে একটা বিরাশি সিক্কা। এটাই আশা করছিল রানা। ঘুসিটা বেমালুম হজম করল সে, কিন্তু তার হাতের ইস্পাতের পাতটা বিদ্যুৎ বেগে ঢুকে গেল লোকটার ঘাড়ের পাশ দিয়ে পুরো সাড়ে সাত ইঞ্চি। ষাঁড়ের মত গর্জন করে এল দ্বিতীয় লোকটা। একটু ডান দিকে সরে গিয়ে কারাতের ডেথ ব্লো মারল রানা ওর ঘাড় বরাবর। কড়াৎ করে একটা শব্দ হলো। তৎক্ষণাৎ না

মরলেও ওর দেহটা মাটিতে পড়ার আগেই যে ও প্রাণ হারাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইস্পাতের পাতটা একটানে বের করে নিয়ে আর দেরি করল না রানা। এক দিনের জন্যে অনেক অ্যাকশন হয়ে গেছে। ওয়াটার প্রুফ ব্যাগটা নিয়ে পানিতে নামল। সিকি মাইল দূরেই দুলছে কেবিন ক্রুজার মোবাইল গার্ল।

ইনফ্রা রেড লেন্সের বিনকিউলারটা চোখ থেকে নামিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল রেভারেন্ড লিগুরী। উঁচু জায়গাটা থেকে পুরো ব্যাপারটাই সে দেখেছে। গাড়ির বুট থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করে এনে পেছনের সীটের ওপর রাখল। ডালা খুলতেই দেখা গেল একটা টু-ওয়ে রেডিও সেট। এক্সপার্ট হাতে ওটা টিউন করল রেভারেন্ড লিগুরী। ওদিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, জিমি, এখনও ওর শরীরে তোমার ইনজেক্ট করা এক্স এল ফাইভ এর যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে দু'মাইলের মধ্যে থাকলে ওকে ট্রেস করা সম্ভব।'

'ধরা পড়েছে তাহলে শেষ পর্যন্ত?'

'নাহ্। ধরা গেল না। যন্ত্র দিয়ে পাঠালাম দু'জনকে—খুঁজে ঠিকই বের করল ওরা ওকে। এই তো, এক মিনিটও হয়নি। বিনকিউলার দিয়ে দেখলাম, চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল দু'জন। মোবাইল গার্লে গিয়ে উঠল রবার্ট ক্রফোর্ডের ছদ্মবেশে। আশ্চর্য, জিমি, ডুয়েন্সেম ব্যুরোর এমন দুর্দান্ত লোক আছে জানা ছিল না আমার।'

'ডুয়েন্সেম ব্যুরোর লোক নয় ও। ওর আসল নাম মাসুদ রানা। বাংলাদেশের স্পাই। বসের কড়া নির্দেশ, লোকটা ভয়ঙ্কর, ওকে যেমন করেই হোক শেষ করতে হবে। ওকে সরাতে না পারলে ভণ্ডুল হয়ে যাবে আমাদের সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম।'

'ঠিক আছে। আমি নিজে সে ভার নিচ্ছি। এবার পালিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সামনের বার যেন পালাবার কোন রাস্তা না থাকে সেই ব্যবস্থাই নেব। ওভার অ্যান্ড আউট।'

সাত

সেলুলয়েডের পাত দিয়ে ল্যাচ লক খোলার মৃদু শব্দ হলো। খুব আস্তে। সামান্য ফাঁক হলো দরজাটা। তারপর আস্তে আস্তে পুরোটা খুলে গেল বারান্দার আলো এসে ঢুকছে অন্ধকার ঘরটায়। মেয়েটা ক্ষণিক ইতস্তত করল

দরজায় দাঁড়িয়ে। সুঠাম দেহের অধিকারী মেয়েটি। ছিপছিপে, একহারা, লম্বা। বারান্দার আলোয় মেয়েটির ফিগার সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটি ঘরে ঢুকে। আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল ঘর দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই।

অন্ধকারের মধ্যেও স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। ঘরের মাঝখানে রয়েছে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ফাইলিং ক্যাবিনেটটা রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। গোটা কয়েক চেয়ার রয়েছে টেবিরের পাশে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায়। সবগুলোই ঠিক ঠিক পাশ কাটিয়ে পুরু কার্পেটের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে স্টীলের দরজা পর্যন্ত পৌছে পায়ের জুতো খুলে ফেলল মেয়েটা।

এইবার একটু সময় নিল তালা দুটো খুলতে। কমবিনেশন লক—খুব অ্যাড্‌ভানসড্‌ ডিজাইনের। কিন্তু ওর পক্ষে খোলা অসম্ভব এমন তালা পৃথিবীতে কমই আছে। খোদ গিলটি মিঞার কাছে স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছে সে তিনমাস। তিন মাসেই তালার ব্যাপারে এক্সপার্ট বানিয়ে দিয়েছে ওকে গিলটি মিঞা। সতেরো মিনিটের মাথায় দুটো তালাই খুলে ফেলল সোহানা। আগের ঘরটার চেয়ে একটু ছোটই হবে এই ঘর। টাইল করা মেঝে। নিঃশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সোহানা। ডান দিকের ড্রয়ার টেনে পেন্সিল টর্চ দিয়ে কার্ডেক্স ফাইলের একটা কার্ড থেকে একটা নম্বর জেনে নিল। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো শেলফের কাছে এসে আবার পেন্সিল টর্চ জ্বালল। থরে থরে ম্যাগনেটিক টেপের স্পুল সাজানো রয়েছে। কার্ডে দেখে আসা নম্বরের স্পুলটা তুলে নিয়ে টেপরেকর্ডারে ভরল সে। অন্ করে দিল টেপরেকর্ডার।

তিনদিন হলো এখানে কাজে যোগ দিয়েছে সোহানা। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত রেকর্ড রাখার ভার পড়েছে ওর ওপর। ফাইল ঘেঁটে প্রথম দিনই টের পেয়েছে সে প্যাট্রিসিয়া ব্যান্ডের ফাইল আপ-টু-ডেট নেই। তার গত ছ'মাসের কাজে কিছু ব্যতিক্রম আর অস্থিরতা লক্ষ করে সিকিউরিটি হেড তার কেসটা রেফার করে প্রজেক্ট সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর হ্যারী ট্যালবটের কাছে। ডক্টর ট্যালবট জবাবে একটা মেমো পাঠিয়েছিলেন এই মর্মে যে তাঁর মতে ট্রিসা ব্যান্ড সিকিউরিটি রিস্ক নয়। বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ বলেই বাবার স্ট্রোকের পর থেকে ট্রিসা স্বভাবতই একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাকে বাবার সঙ্গে কিছু দিন কাটিয়ে আসার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

খুবই ভাল কথা—কিন্তু ওই মেমোর সঙ্গে ডক্টর ট্যালবটের সাথে ট্রিসার ইন্টারভিউ-এর একটা টাইপ করা কপিও থাকা উচিত ছিল—সেটা নেই। এটা যে কেবল সোহানার চোখেই পড়েছে তা নয়। সিকিউরিটি হেডও এটা লক্ষ করে.ডক্টর ট্যালবটকে খুঁটিনাটি রিপোর্ট পাঠানোর জন্যে তাগিদ দিয়েছিল। জবাবে ডক্টর ট্যালবট জানায় যে কাজের চাপে তার অফিস রিপোর্ট তৈরি করে উঠতে পারেনি। তারপরে ওখানেই ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যায়।

ডক্টর ট্যালবটের অফিসের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করেই টের পেয়েছিল

সোহানা, মিথ্যা অজুহাত ওটা। খুবই কাজের মানুষ ডক্টর ট্যালবট। তার অফিস সব কাজে আপটুডেট তো আছেই—কোন কোন কাজ আবার আগে থেকেই করা আছে। পেছনে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। ট্রিসার ব্যাপারে পেছনে পড়াটা উদ্দেশ্যমূলক।

শেষ হয়ে গেল টেপ। এমন কিছু তথ্য পাওয়া গেল না এটাতে। বাজানো টেপটা যথাস্থানে রেখে দ্বিতীয় টেপ নিয়ে এল সোহানা। তার বদ্ধমূল ধারণা এই টেপের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা ডক্টর ট্যালবট যে কারণেই হোক চেপে যেতে চাইছে বলেই রিপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করছে।

দ্বিতীয় টেপটা চালু করল সোহানা। ডক্টর ট্যালবটের গলা শোনা যাচ্ছে। নরম গলায় প্রায় ফিসফিসিয়ে কথা বলছে সে। কষ্ট হচ্ছে শুনতে, তবু শব্দ বাড়াতে সাহস পেল না সোহানা। টেপ রেকর্ডারের ওপর ঝুঁকে পড়ল। শুনতে পেল: '...তোমার দুঃস্বপ্নের কথা বলেছিলে তুমি—বোমা, রক্ত, মৃত্যু এসব যা দেখছ এটা সম্ভবত হ্যামবুর্গে বোমার আঘাতে তোমার মায়ের মৃত্যুরই প্রতিক্রিয়া।'

'কিন্তু মায়ের মৃত্যুর কথা তো আমার মনে নেই—আমার বয়স দুই বছর ছিল যখন আমার মা মারা যায়। স্বপ্নে যা দেখি তাতে আমার বয়স প্রায় তিন বছর। আর স্বপ্নে যাকে হারাই সে মা নয়—বোন।'

'আবার তুমি ওই কথাই বলছ, ট্রিসা। কিন্তু আমরা দু'জনেই জানি যে তোমার কোন বোন নেই, কোনদিন ছিলও না। ছোট, বড় বা যমজ কোন রকম বোনই না। তোমার বাবা তোমাকে বলেছেন সে কথা—রিপোর্টেও তাই আছে।'

'সারাটা জীবন আমি কেমন যেন একটা দুঃখ, একটা ব্যথা মত অনুভব করেছি। মনে হয় যেন আমি সম্পূর্ণ নই। আমাকে অর্ধেক করা হয়েছে কেটে। আমার অর্ধেক অংশ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। একটা বইয়ে পড়েছি যমজ সন্তানরা একে অন্যের জন্যে নাকি ঠিক এই রকম ব্যথা অনুভব করে।'

'তোমার কোন যমজ বোন নেই, ট্রিসা, তুমি সাধারণ কেউ হলে তবু একটা সম্ভাবনা ছিল তোমার একটা বোন থাকার বা কোন রকম ভুল হবার। কিন্তু তোমার বাবার ও তোমার অতীত ফ্রান্সের অন্তত বারোটা বিভিন্ন এজেন্সী চেক করেছে বারো ভাবে। তারা সবাই একই রিপোর্ট দিয়েছে। আর তোমার বাবা? তোমার কোন বোন থাকলে তোমার বাবার তো সেটা অজানা থাকবার কথা নয়?'

কিছুক্ষণ টেপ ঘোরার পর আবার ডক্টর ট্যালবটের গলা শোনা গেল, 'তুমি বুঝতে পারছ না তোমারই অবচেতন মনের ছাপ পড়ছে তোমার চেতন মনের ওপর। আলাদা কোন সত্তার নয়।'

'কিন্তু কিছুদিন হলো খুব বেশি রকম দেখছি আমি অনেকবার দেখা সেই

একই স্বপ্ন। প্রায় প্রত্যেক রাতেই আমি তার গলার স্বর শুনতে পাই। চিৎকার করে ডাকে সে আমাকে ঠিক ছাদটা ধসে পড়ার আগে। তারপরেই দেখি আমি রক্ত আর আগুনের নদীর ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছি।'...কেঁদে ফেলল ট্রিসা।

সহানুভূতি মাখা স্বরে ডক্টর ট্যালবট প্রবোধ দিল ট্রিসাকে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, ট্রিসা। আমি বলছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। কেঁদে মনটা একটু হালকা করে নাও। অনেক ভাল বোধ করবে তাহলে।'

আবার ডক্টর ট্যালবটের গলা শোনা গেল: 'ট্রিসার মধ্যে প্রকট স্কাইযোফ্রেনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।' কিছুক্ষণ নীরবে টেপ ঘোরার পর স্বগতোক্তির মত শোনা গেল আবার। খুব নিচু স্বরে: 'কোন পুরুষের গভীর প্রেম, উষ্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া এই স্কাইযোফ্রেনিয়া ভেঙে দিতে পারে। আমি কি দিতে পারি না ওকে এই প্রেম?...খুবই আকর্ষণীয় মেয়ে ট্রিসা।...টেপ হয়ে গেল...পরে মুছে ফেলতে হবে এই জায়গাটা...হ্যাঁ, ট্রিসার মধ্যে আরও দেখা যাচ্ছে...'

মৃদু হাসি ফুটে উঠল সোহানার ঠোঁটের কোণে। তাহলে এই কারণেই রিপোর্ট দেরি হচ্ছে। মজেছে ডাক্তার। তৃতীয় টেপটা শুনতে হয়। টেপটা বদলে তৃতীয় টেপটা লাগাল সে টেপরেকর্ডারে।

'ডক্টর ট্যালবট, কিছু কথা আমি আর নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছি না। কাউকে আমার বলতেই হবে। প্রথম দুই ইন্টারভিউয়ে আমি যেসব কথা বলেছিলাম আমি স্বপ্নে দেখেছি, তার সব স্বপ্ন ছিল না। বাবার কথা বলছি আমি। বেগ সিটিতে আসার পর থেকে যেসব লোকের আনাগোনা হয় বাবার কাছে—এটা আমার কাছে কল্পনা নয়, ডাক্তার—উনি সত্যিই খুব বিপদের মধ্যে আছেন—আমরা সবাই বিপদে আছি। বিশ্বাস করুন, ডক্টর, আমরা সবাই বিপদে আছি আর বাবার স্ট্রোক...'

'অমন ভাবে কথা বোলো না, ট্রিসা।' জোর করেই থামিয়ে দিল তাকে ডক্টর ট্যালবট 'তোমার তো অজানা নেই যে তোমার বলা প্রত্যেকটা কথা তোমার ফাইলে যাবে শেষ পর্যন্ত। যাকগে আমি এই কথাগুলো পরে মুছে ফেলব। স্বপ্নের বিবরণ দেওয়া এক জিনিস আর সেটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করা অন্য জিনিস। জানো, এই কথাগুলো তোমার ফাইলে গেলে তোমার ক্যারিয়ার চিরদিনের জন্যে শেষ হয়ে যাবে? তোমাকে সিকিউরিটি রিস্ক হিসেবে গণ্য করা হবে।...তোমাকে সত্যি কথাই বলছি আমি, ট্রিসা, তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। কয়েক মাস তুমি বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এসো—তারপর দেখি আমি কি করা যায়। আমি সেই ভাবেই রিকমেন্ড করে পাঠাব।'

এতই নিবিষ্ট মনে টেপের কথাগুলো শুনছিল সোহানা যে সে টেরই পায়নি ধীরে ধীরে বাইরের অফিসের অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসছে লোকটার হাতের চাপে দরজাটা একটু একটু করে খুলে গেল। গুটি গুটি পায়ে নিঃশব্দে লোকটা স্টীলের আধ খোলা দরজাটার কাছে পৌঁছে গেল। হাতে

উদ্যত একটা রিভলভার। টেপ রেকর্ডারের আওয়াজ কানে গেল লোকটার…ট্রিসা বলছে, 'বুঝলাম। আপনার সত্যিই ধারণা মানসিক বিকার ঘটেছে আমার।'

'না, বিকারগ্রস্ত নয়, আমি বলব অত্যধিক কাজের চাপে পরিশ্রান্ত।'

'আমি মোটেও বিশ্বাস করি না। আপনার নিশ্চয়ই ধারণা আমি সাংঘাতিক রকম অসুস্থ। একটু আগেই আপনি বললেন যে এই ইন্টারভিউ-এর সব কথা আমার ফাইলে গেলে আমাকে এই প্রজেক্ট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। আমাকে অসুস্থ না ভাবলে আপনি কেন আমাকে বাঁচাবার জন্যে আপনার পেশাগত সুনাম নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন? আপনি জানেন না কি ঘটবে যদি এই টেপের কথাগুলো মুছে ফেলার ব্যাপারটা জানাজানি হয়?'

'আমি চোখের সামনে একজন বৈজ্ঞানিকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাওয়া দেখতে পারি না।' একটু নীরবতার পর আবার শোনা গেল ডক্টর ট্যালবটের গলা: 'না, সেটাও আসলে সত্যি নয়। তুমি কি এখনও বুঝতে পারোনি, ট্রিসা, কেন আমি এটা করছি? আমি তোমাকে ভালবাসি, ট্রিসা। তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিন থেকেই তোমাকে আমি ভালবেসেছি।'…আবার শোনা গেল ডক্টর ট্যালবটের গলা…কিন্তু এবার টেপে নয়…স্টীলের দরজার পাশ থেকে, 'আমার গোপন কথা তাহলে জেনে ফেলেছ দেখছি।' ঘরের বাতিটা জ্বলে উঠল কথার সঙ্গে। ঝট করে ঘুরে তাকাল সোহানা। ডাক্তার! স্থির হাতে রিভলভার ধরে আছে সোহানার কপাল বরাবর।

সন্ধ্যায় বার-ডি-রিগাল-এ ঢুকেই লক্ষ করল রানা ট্রিসা বসে আছে কোণের একটা টেবিলে। একা। তার সামনে একটা ভদকা মার্টিনির গ্লাস। হালকা নীল রং-এর একটা ইভনিং ড্রেস পরেছে ট্রিসা। খুব সরু চেনের মাথায় একটা বিরাট হীরা ঝুলছে তার গলায়। খুব সুন্দর, অথচ কেমন যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছে ট্রিসাকে। সোজা ট্রিসার টেবিলের দিকেই পা বাড়াল রানা। পাশে রাখা বেঢপ রকম বড় হ্যান্ড-ব্যাগটার মধ্যে কি যেন খুঁজছে ট্রিসা…হ্যাঁ পেয়ে গেছে…একটা 'স্টুভেসান্তে' সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল সে। রানার ইলেকট্রোনিক লাইটারটা জ্বলে উঠল ট্রিসার মুখের সামনে। সিগারেটটা ধরিয়ে চোখ তুলে চাইল সে।

'গুড ইভনিং!' মধুর হাসি হেসে বলল রানা, 'আমার নাম রবার্ট ক্রফোর্ড। বসতে পারি? আপনাকে একা একা বসে থাকতে দেখে এলাম। আমিও একা। একটা ড্রিঙ্ক আনাই আপনার জন্যে?'

তাকিয়ে রয়েছে ট্রিসা। রানাকে ভাল করে যাচাই করে নিচ্ছে তার চোখ।

'বসুন।' আস্তে করে বলল ট্রিসা, 'কিন্তু ড্রিঙ্ক নয়—যদি জিজ্ঞেস করেন

নাচব কিনা—বলব, আমার আপত্তি নেই।'

সুযোগ হারাল না রানা। হাত বাড়াল সে। রানার হাত ধরে উঠে এল ট্রিসা। ব্রাস ব্যান্ড 'ইয়াম্ ব্যাম্বি' বাজাচ্ছে খুব জোরেশোরে। বংগোটা খুব ভাল বাজাচ্ছে।

মনে হচ্ছে কোন কিছুতেই যেন ট্রিসার মন নেই। ট্রিসা নাচছে ভালই. তবু সেদিনকার মত ফ্লো আসছে না। প্রথমে রানা ভেবেছিল হয়তো বা এই তালের জন্যেই জমছে না নাচটা—কিন্তু কয়েকটা নাচ পর পর নাচল ওরা। তাল বদলাল—রাম্বা, জাইভিং ওয়ালজ, ফক্সট্রট কিন্তু কোনটাই ঠিক সেদিনের মত জমল না। সব সময়েই কোথায় যেন একটা ব্যবধান রয়ে গেল। নাচতে নাচতেই ভিড় থেকে একটু সরে এল ওরা। নাচ থামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রানা ট্রিসার দিকে। বুঝতে পারছে না রানা, আজকে যেন ট্রিসাকে একটু অন্য রকম লাগছে।

আধ বোজা চোখে রানার গায়ে গা এলিয়ে দিয়েছে ট্রিসা। মৃদু কণ্ঠে ট্রিসা বলল, 'কেমন যেন মাথাটা ঝিম ঝিম করছে এখানে ভিড়ের মধ্যে—একটু হাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াই ব্যালকনিতে।'

ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল ওরা। দূরে হোটেল সি-ভিউ-এর আলোকিত সুইমিং পুলটা দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে। আরও দূরে কালো সমুদ্র। দেখা যাচ্ছে না—কেবল গর্জন শোনা যাচ্ছে।

রানার গা ঘেঁষে এল ট্রিসা। ভাব বুঝে হালকা একটা চুমো খেল রানা ট্রিসার ঠোঁটে।

ঠিক এই সময়ে পাড়ল ট্রিসা কথাটা। সেদিন বেনসন বেশধারী রানার কাছে যেমন করে বলেছিল ঠিক তেমন করে বলল, 'একটা নির্জন বীচ আছে মাইল দেড়েক দূরে। কেউ ওদিকটায় যায় না।'

বুড়োগুলোকে মেরে কোন লাভই হয়নি, ভাবল রানা। সেই বোট হাউসের সামনে পড়ে থাকা মৃত বুড়ো দু'জন ছাড়াও আরও কেউ জানে যে ডক্টর নিমেরী ফ্লেচার আর রবার্ট ক্রফোর্ড একই ব্যক্তি। ট্রিসাকে পাঠানো হয়েছে তাকে আবার বীচের ধারে নিয়ে যাবার জন্যে। মোটেও সময় নষ্ট করেনি ওরা। রানা কেবলমাত্র ফিরে এসে স্নান সেরে গোটা কয়েক স্যান্ড উইচ খেয়েই বার-ডি-রিগালে এসেছে। এরই মধ্যে ওরা ওদের কর্মপন্থা ঠিক করে আঘাত হানার জন্যে তৈরি! মনে মনে ওদের ক্ষিপ্রতার প্রশংসা না করে পারল না সে। কিন্তু ন্যাড়া বেল তলায় যায় ক'বার? রানাকে আবার সেই একই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাটা কি একটু বেশি ছেলেমানুষী হয়ে গেল না? খটকা বাধল রানার মনে। ব্যাপার কি? আর যাই হোক এদের ছেলেমানুষ মনে করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তবু কেন এই প্রস্তাব?

দ্রুত চিন্তা করে নিচ্ছিল রানা। ওদের প্ল্যান অনুযায়ী এগুতে দেওয়া ঠিক

হবে না। দুই হাত কাঁধে রেখে একটু দূরে সরাল সে ট্রিসাকে। তারপর ওর গলায় পরা হীরেটায় ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে বলল, 'এটা পরে তুমি যেতে চাও নির্জন বীচে? ফ্রান্সের সব ডাকাত ধাওয়া করবে, আমাদের পিছু পিছু—নির্জন বীচ আর নির্জন থাকবে না!…তাছাড়া আমি একটা জরুরী টেলিফোন কল আশা করছি আমার রুমে আজ রাতে। নির্জনতার দিক দিয়ে আমার রুমটাই বা কম যায় কিসে?'

এমনভাবে সোজাসুজি বলে ফেলায় ঈষৎ লাল হয়ে ওঠা মুখটা ঘুরিয়ে নিল ট্রিসা। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে।'

নিজের কামরায় ফিরেই বাইরের ঘরে ট্রিসাকে বসিয়ে ওর জন্যে ড্রিঙ্ক আনতে যাবার ছুতোয় পুরো সুইটটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। কোন ঝুঁকি নিতেই আর রাজি নয় সে। নিশ্চিন্ত হলো রানা—তার অনুপস্থিতিতে কেউ ঢোকেনি ভিতরে। বেডরুমের মিনিয়েচার বার থেকে এক বোতল ভারমুথ বের করে নিয়ে এল সে। সেই সঙ্গে দুটো গ্লাস।

'ভারমুথ চলবে তো তোমার?' বোতলটা উঁচিয়ে দেখাল রানা। মাথা হেলিয়ে সায় দিল ট্রিসা।

ভারমুথের গ্লাসটা এগিয়ে দিতেই এক চুমুকে শেষ করল ট্রিসা পুরোটা। ওর খালি গ্লাসটা নিয়ে আবার কিছুটা ভারমুথ ঢেলে দিল রানা। মনে মনে খুশি হয়েছে সে। আর দশটা মিনিট বড় জোর—তার পরই মুখ খুলবে ট্রিসার। ওর গ্লাসে একটা বড়ি মিশিয়ে দিয়েছে রানা। স্কোপোলামিনের বড়ি। ট্রুথ সিরাম। এই উদ্দেশ্যেই ভারমুথ বের করে এনেছে সে—এর কড়া মিষ্টি স্বাদে স্কোপোলামিনের স্বাদ টের পাবে না ট্রিসা।

ভিতর ভিতর উত্তেজিত বোধ করছে রানা। কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে ট্রিসা আজ। ওদের অজানা নেই যে রবার্ট ক্রফোর্ড আর কেউ নয়—মাসুদ রানা। নিশ্চয়ই কোন বিশেষ মতলব হাসিল করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে ওকে। সেটা কি, জানা যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রিসার কথামত নির্জন বীচে যায়নি রানা, এটা একটা পরিবর্তন, কিন্তু এক কথায় ওর ঘরে আসতে যখন রাজি হয়ে গেল ট্রিসা, কেমন যেন খটকা লাগছে এখন—কেন যেন মনে হচ্ছে রানার, ওদের উদ্দেশ্য বিফল করে দিতে পারেনি সে। কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে ওর চারপাশে। কি সেটা? দশ মিনিটের আগেই ঘটে যাবে না তো সেটা?

হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে যাওয়ায় উঠে দাঁড়াল ট্রিসা 'কিছু যদি মনে না করো…আমি আসছি পাঁচ মিনিটের…'

মাথা নাড়ল রানা। এখন কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারে না সে ট্রিসাকে। এগিয়ে এসে একটানে বুকের ওপর নিয়ে এল ওকে।।

'প্লীজ! এক্ষুণি আসছি আমি…' অসম্পূর্ণ রয়ে গেল ওর বক্তব্য। রানার নিষ্ঠুর একজোড়া ঠোঁট নেমে এসেছে

*

ট্রিসার চোখের মণি অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে আছে ওরা দু'জন, পাশাপাশি। শুয়ে শুয়ে ভাবছে রানা। সেদিনকার ট্রিসার সঙ্গে আজকের ট্রিসার ব্যবহারে কোন মিল নেই। একই মেয়ের পক্ষে এমন ভিন্ন স্বভাবের অভিনয় করা কি সম্ভব? সেদিনের সেই উচ্ছল প্রাণ চাঞ্চল্য আজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কেন? জানার সময় ঘনিয়ে এসেছে—কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জানতে পারবে সে। আর সময় নষ্ট করা চলে না। যা জানার এখনই ঝটপট জেনে নিতে হবে ওষুধের প্রভাব কেটে যাবার আগেই।

'কলিন মারা যাওয়ার সময়ে তুমি কি সেখানে উপস্থিত ছিলে?' সরাসরিই জিজ্ঞেস করল রানা কোন ভণিতা না করে।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ট্রিসা। রবার্ট ওকথা কেমন করে জানল, কেনই বা তাকে প্রশ্ন করছে, এসব চিন্তা করার মত ইচ্ছা শক্তি আর ট্রিসার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

'আশ্চর্য! অথচ একটা ব্লন্ড মেয়েকে সাদা কনভার্টিবল গাড়ি চালিয়ে ওখান থেকে চলে যেতে দেখা গেছে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ?' চোখ খুলে রানার মুখের ভাব বুঝবার চেষ্টা করল ট্রিসা। 'না, না, আমি কলিনকে ভালবাসতাম। আমি সত্যিই ভালবাসতাম ওকে।'

সব গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে রানার। ট্রিসা যদি গাড়ি চাপা দিয়ে কলিনকে না মেরে থাকে তবে কে গাড়িটা চালাচ্ছিল?

'প্রথম থেকে সব খুলে বলো। সব। কিছুই বাদ দেবে না।'

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে আরম্ভ করল ট্রিসা, 'কলিন এই হোটেলেই উঠেছিল···এখানেই ওর সঙ্গে আমার হঠাৎ করে পরিচয় হয়। মানে আমি তাই ভেবেছিলাম···আস্তে আস্তে আমাদের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে আমি কথায় কথায় জানতে পারি যে আমাদের দৈবাৎ পরিচয় হয়নি—কলিন প্ল্যান করেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল। ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার···তুমুল ঝগড়া হয় আমাদের সেদিন।'

'কি নিয়ে ঝগড়া?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'সব জেনে আমার ধারণা হলো কলিন আমাকে আসলে সত্যি সত্যি ভালবাসে না। আমার সঙ্গে মিথ্যে অভিনয় করেছে প্রেমের—আলাপ জমিয়েছে আমার আর বাবার ওপর স্পাইং করার জন্যে। ওরও ধারণা ছিল বাবা সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে আছেন। অনেক লোকের সামনেই সেদিন আমি রাগের মাথায় ওর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি চলে যাই।···বাড়িতে মাথা ঠাণ্ডা হলে ভাবলাম কলিন হয়তো আমাদের সাহায্য করতে পারে—হয়তো সে কোন গভমেন্ট এজেন্সীর লোক। ফোন করলাম আমি তাকে···'

'বাসা থেকে?'

'হ্যাঁ, তাকে ফোনে বললাম সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে ওই নির্জন

বাঁচে।…সেখানে কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না…গোপনে আলাপ করতে পারব ভেবেছিলাম…কিন্তু…' হাত দিয়ে কপাল ঘসল ট্রিসা, কিছু মনে করতে চেষ্টা করছে সে, 'জানি না কি হলো…বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি…যখন জ্ঞান ফিরল জিমির কাছে জানলাম কলিন গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মারা গেছে।…শুনেই আবার জ্ঞান হারাই আমি।…'

'তুমি কলিনের সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ করতে চেয়েছিলে? তোমার বাবা, জিমি আর লি-বিউসে প্রজেক্ট সম্বন্ধে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল ট্রিসা…থামিয়ে দিল তাকে রানা।

'আজ সন্ধ্যায় কি জিমি পাঠিয়েছে তোমাকে আমার এখানে?'

আবার মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ট্রিসা। 'কলিনের মৃত্যুতে আঘাত পেয়েছিলাম আমি। সবসময় মনমরা হয়ে থাকতাম…জিমি বলল বার-ডি-রিগালে গেলে তোমার সঙ্গে আলাপ হবে আমার…সন্ধ্যাটা সুন্দর কাটবে। জিমি কি করে আগে থেকেই জানল জানি না…জানতে চাইও না…জিমির কথা শুনে আমার ভালই হয়েছে—অপূর্ব কেটেছে আমার সন্ধ্যাটা।…তবে ওই বেঢপ রকমের হ্যান্ড ব্যাগটা আমি কিছুতেই আনতে চাইনি—কিন্তু জিমি জোর করল…'

হ্যান্ড ব্যাগ! দ্রুত চিন্তা চালু হয় গেল রানার মাথায়। ইশ্—কি করে তার নজর এড়িয়ে গেল ওটা? লক্ষ করেছিল সে ঠিকই কিন্তু আমল দেয়নি শেষ পর্যন্ত।

ট্রিসার দিকে বিছানার পাশে একটা চেয়ারে রাখা রয়েছে হ্যান্ড ব্যাগটা।

শেষ মুহূর্তে অন্য সিদ্ধান্ত নিল রানা। লাফিয়ে উঠে হ্যান্ডব্যাগটা জানালা দিয়ে ফেলে দেয়ার প্রবল ইচ্ছাটা দমন করল সে। কেন যেন মনে হলো ওর, সময় নেই। ট্রিসাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে এক গড়ান দিয়ে মেঝেতে পড়ল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে গেল ওর।

আট

বেঁটে মত রিভলভারটার দিকে চেয়ে রয়েছে সোহানা অবাক দৃষ্টিতে। কখন যে চুপিসারে ডক্টর ট্যালবট ঘরে ঢুকেছে টেরই পায়নি সে।

'টেপগুলো সবই শুনে ফেলেছেন দেখছি। ওই টেপের তথ্য বাইরে প্রকাশ পেয়ে গেলে আমার ক্যারিয়ার একেবারে শেষ। আপনাকে মেরে ফেলা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই, বুঝতেই পারছেন?'

কিন্তু ডক্টর ট্যালবট যে কিছুতেই সাহস করে ট্রিগারটা টিপতে পারবে না

এটা বুঝে নিতে সময় লাগল না সোহানার। পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে মিষ্টি হাসল সে। জবাব দিল না।

'ট্রিসার ব্যাপারে আপনার এই অহেতুক আগ্রহ কেন? আপনি কি সরকারের পক্ষ থেকে ট্রিসার অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করছেন?'

'আমি সরকারী পক্ষের লোক কে বলল আপনাকে?' প্রশ্ন করল সোহানা।

'ওই স্টীলের দরজার কমবিনেশন জানা না থাকলে কারও পক্ষে খোলা সম্ভব নয়। সিকিউরিটি অফিসার আর আমি ছাড়া আর কারও ওই কমবিনেশন জানা নেই। সরকারী পক্ষের লোক না হলে সিকিউরিটি অফিসার আপনাকে কিছুতেই তালার কমবিনেশন জানাত না। এটা বোঝার মত ঘিলু আমার আছে।'

আশার আলো দেখতে পেল সোহানা। আজ রাতে ওর এই অফিসে আসার কথা সিকিউরিটি অফিসার জানে বলেই ধরে নিয়েছে ডাক্তার। ভুল ভাঙাল না সে ডক্টর ট্যালবটের। লি-বিউসে প্রজেক্টে কাজ নিয়ে আসার প্রথম উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে সোহানার যদি তার এই অনধিকার প্রবেশের কথা জানাজানি হয়ে যায়। কথার মোড় এবার অন্যদিকে ফেরাল সে। সহানুভূতির সঙ্গে বলল, 'ট্রিসার প্রতি আপনার বিশেষ দুর্বলতার ফলেই যে আপনি পুরো ব্যাপারটা চেপে গেছেন তা বেশ বুঝতে পারছি। আপনার পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেলে এ ব্যাপারে আপনার কোন হাত আছে সে কথা আমার রিপোর্টে উল্লেখ নাও করতে পারি।'

'কি ধরনের সহযোগিতা চান আপনি?'

'ট্রিসার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আপনি যে সমস্ত নোট করেছেন সেগুলো দেখতে চাই।'

'ওগুলো এখানে নেই। কোয়ার্টারে আমার ঘরে লুকোনো আছে।'

'চলুন।' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল সোহানা রিভলভারটার উদ্দেশে। বাধ্য ছেলের মত ডক্টর ট্যালবট হস্তান্তর করল রিভলভারটা। তারপর ধপ্ করে পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল। স্বগতোক্তির মত বলতে লাগল, 'ট্রিসার অবস্থাটা একান্তই সাময়িক। বিশ্বাস করুন। না, ওর প্রতি আমার আসক্তি আছে বলে বলছি না। সত্যিই আমি বিশ্বাস করি যে ওর গুরুতর কোন মানসিক অসুখ হয়নি। যারা প্রতিভাবান তাদের মধ্যে সচরাচর একটু আধটু অসঙ্গতি বা সাধারণের থেকে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু সাধারণের সঙ্গে পার্থক্য আছে বলেই না তারা প্রতিভাবান, নইলে তো তারা সাধারণ মানুষই হত।'

'আপনি কি বলতে চান ট্রিসা সিকিউরিটি রিস্ক নয়? তাকে লিবিউসের এই টপ সিক্রেট প্রজেক্টের কাজে বহাল রাখলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই?'

'হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস। চলুন, আপনাকে আমার নোটগুলো

দেখাচ্ছি। আগামীকাল কাজে যোগ দিচ্ছে বলে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে ট্রিসা। আমার সাথে ওর পরবর্তী ইন্টারভিউয়ে আপনার উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করব আমি। এর পরেও যদি আপনার কোন সন্দেহ থাকে ট্রিসার সম্বন্ধে তবে আমি নিজে আমার কুকীর্তির কথা রিপোর্ট করে রিজাইন দেব।'

উঠে পড়ল ডক্টর ট্যালবট। সোহানাও উঠল।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ড।

'প্যাপ্পি! প্যাপ্পি! ফ্রলিন!' ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর দুই চোখ। রক্ত ঝরছে ঠোঁটের কোণ বেয়ে। 'বোমা, বোমা···বাংকারে··· বাঁচাও, বাঁচাও!···বাবা আর বোন···বাঁচাও!'

উঠে বসে মাথা ঝাড়া দিল রানা। এক সেকেন্ডের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঘরটা। দাউ দাউ করে জ্বলছে তোশকবালিশ। আগুন ধরে গেছে কয়েকটা ফার্নিচারেও। ঘন কালো ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘর। আর দেরি করলে দিক হারিয়ে ফেলবে, পৌঁছতে পারবে না দরজা পর্যন্ত।

দ্রুত হাতে জখমগুলো পরীক্ষা করল রানা। কোনটাই মারাত্মক কিছু না। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কানের পর্দায় চোট লেগেছে বলে রক্ত বেরিয়ে এসেছে ওদের মুখ থেকে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ভাঙাচোরা বিশাল ডাব্‌ল্ বেড খাটটার দিকে এক নজর চেয়েই বুঝতে পারল রানা, প্রায় মেঝে পর্যন্ত নিচু বলেই রক্ষা পেয়েছে ওরা এযাত্রা। তা নইলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত ওদের দেহ।

হ্যান্ড ব্যাগের লাইনিঙের মধ্যে টাইমিং ডিভাইস ফিট করা সাইক্লোনাইট অথবা আর ডি এক্স ছিল। এমন ব্যবস্থা ছিল যেন বিস্ফোরণটা ওপর দিকে না গিয়ে চারপাশে ছড়ায়। হীরের নেকলেসটা নির্জন বীচে গলায় রাখা নিরাপদ নয় বলে ব্যাগে পুরে রাখতে বলবে রানা, এটাই স্বাভাবিক। ওটা ব্যাগে পুরে খুব কাছাকাছিই রাখবে ট্রিসা, এটাও স্বাভাবিক।

তার মানে শুধু রানা নয়, ট্রিসাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল ওরা! কেন?

বাইরে চিৎকার, হৈ-হট্টগোল আর দৌড়াদৌড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বিপদ যে এখনও কাটেনি বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। জিমির লোক যে কাছে পিঠেই কোথাও থাকবে এবং বিস্ফোরণের ফলাফল জানাবে হেড-কোয়ার্টারে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ওরা বেঁচে গেছে জানলে আবার আক্রমণের আদেশ দেয়া হবে। এই হোটেল থেকে বেরোবার আগেই যদি কোন অদৃশ্য পিস্তল থেকে গুলি ছুটে আসে, মরবার আগে অবাক হওয়ারও সময় পাওয়া যাবে না। এখন একমাত্র নিরাপদ জায়গা হচ্ছে মোবাইল গার্ল। যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছতে হবে কেবিন ক্রুজারে। হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল রানা ট্রিসাকে। খাটের ওপাশে খুলে ফেলা ট্রিসার জামাকাপড় পুড়ে শেষ। নিজের একটা শার্ট পরাল রানা ওর গায়। হাঁটু পর্যন্ত

ঢাকা পড়ল। এবার ঝটপট একটা হাফপ্যান্ট পরে নিয়ে ঠেলে নিয়ে এল সে ট্রিসাকে দরজার কাছে। করিডরে বেরিয়ে দেখা গেল লিফটের সামনে চল্লিশ-পঞ্চাশজনের একটা ভিড়, সবাই সবাইকে ঠেলে আগে ঢুকতে চেষ্টা করছে লিফটের ভিতর, সেই সঙ্গে চলেছে ভয়ার্ত চিৎকার। ভিড় ঠেলে ট্রিসাকে যতটা সম্ভব কনুইয়ের গুঁতো থেকে বাঁচিয়ে সিঁড়ির মুখে পৌঁছল রানা। এবার ট্রিসাকে কাঁধে তুলে তরতর করে নামতে শুরু করল।

ফোঁপাচ্ছে ট্রিসা। নামতে নামতে একটা উজ্জ্বল বাতির নিচে থামল রানা। ট্রিসার মুখটা উঁচু করে তুলে ধরে দেখল, এখনও বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে চোখের মণি, ভাবলেশহীন দৃষ্টি। স্কোপোলামিন, সেইসঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ঝাঁকুনি খেয়ে ওর মনটা ছিটকে চলে গেছে শৈশবের কোন একটা ঘটনায়। কোন্ ঘটনা? এয়ার রেইডে ওর মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটা? উঁহুঁ। বোনের কথা বলছে বার বার। কখনও ইংরেজিতে, কখনও ভাঙা ভাঙা জার্মানে। শোয়েস্টারলেইন—ছোট্ট বোন। কাঁধ ধরে বারকয়েক জোর ঝাঁকুনি দিল রানা, তারপর ঠাস করে চড় কষাল ওর গালে। লাভ হলো না কিছুই। বাস্তবে ফিরে আসতে পারছে না কিছুতেই। অবাক হয়ে চেয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে, তারপর বিড় বিড় করে আগুন, বোমা আর বাংকার সম্পর্কে কি যেন বলল। ডুকরে কেঁদে উঠল, 'প্যাপ্পি। ফ্রলিন!'

রানা হতভম্ব ট্রিসার শরীরটা বয়ে দ্রুতপায়ে নেমে এল নিচে। পার্কিং লট পেরিয়ে জনশূন্য লন ধরে ছুটল জেটির দিকে। কেউ নেই জেটিতে। বোমার আওয়াজ আর লোকজনের হৈ চৈ শুনে অ্যাটেন্ডেন্ট গেছে হোটেলের দিকে ব্যাপার কি জানতে। ভালই হয়েছে। ক্রুজারে উঠেই নোঙর তুলে পেছনে সরতে শুরু করল রানা।

মাইলখানেক বামে সরে একটা ফার্স্ট এইড বক্স থেকে গোটাকয়েক ঘুমের বড়ি বের করে খাওয়াল ট্রিসাকে। মনে মনে কর্মপন্থা স্থির করে ফেলেছে সে। আবার যেতে হবে ওর প্রফেসার ব্র্যান্ডের কাছে। অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে সেখানে। আর যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকবে সে, ততক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে ট্রিসাকে।

হাতে ধরে টেনে নিয়ে এল ওকে নিচের বাংকের কাছে। পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিল। ছটফট করে উঠে বসতে যাচ্ছিল ট্রিসা, কাঁধ ধরে ঠেলে শুইয়ে দিল রানা আবার। বলল, 'চুপচাপ ঘুমোও, সব ঠিক হয়ে যাবে।' বারকয়েক সম্মোহনের কৌশলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুই হাতের দশ আঙুল বুলাতেই বুজে এল ট্রিসার চোখ। খানিক বাদেই গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে দেখে বুঝতে পারল, ঘুমিয়ে পড়েছে ট্রিসা। একটা হালকা কম্বল দিয়ে ওর পা থেকে বুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে ফিরে এল রানা ডেকে। ডান দিকে চেয়েই চমকে উঠল সে।

বৃষ্টির মত টুপ টুপ কি যেন পড়ছে নিস্তরঙ্গ সাগরের জলে। ডাঙার দিকে

চাইতেই এই বৃষ্টির উৎস টের পেল সে। বহুদূরে আবছা মত দেখা যাচ্ছে দুটো স্পীডবোট। এত দূরে যে গুলির আওয়াজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় বোটগুলোর দু'পাশে ফেনা দেখতে পাচ্ছে রানা। গতি কিছুটা কমিয়ে খোলা সমুদ্রের দিকে চলতে শুরু করল সে, যতক্ষণে ওরা কাছে এসে পৌঁছবে ততক্ষণে ডাঙা থেকে এতই দূরে সরে যাবে ওরা যে কারও বুঝবার উপায় থাকবে না কি ঘটেছে স্পীডবোট দুটোর কপালে।

বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে স্পীডবোট। ক্রুজারের গায়ে লাগছে গুলি এক-আধটা, বেশির ভাগই হয় সামনে নয়তো পেছনে পড়ছে। স্পেশাল চাবিটা ঢোকাল রানা কন্ট্রোল প্যানেলে, একটা প্যাঁচ দিয়ে টিপে দিল চার নম্বর বোতামটা। এর ফলে চল্লিশ মিলিমিটার বোফার নাক বের করে পজিশন নেয়ার কথা। পেছন থেকে দেখতে লাগবে অনেকটা একজোড়া একজস্ট পাইপের মত। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা আবার। প্রায় ঘাড়ে উঠে এসেছে স্পীডবোট দুটো। শক্তিশালী আওয়েন্স্ এক্স এল নাইনটিন। তীরবেগে আসছে ছুটে। প্রত্যেকটায় তিনজন করে লোক গুলি চালাচ্ছে। দু'পাশ থেকে দু'জন সাব-মেশিনগান চালাচ্ছে, আর মাঝের জন চালাচ্ছে ছাতের ওপর ফিট করা টমসন মেশিনগান। হুইলটা সামান্য ঘোরাল রানা, লাইনে এসে যেতেই টিপ দিল পাশাপাশি সাজানো লাল দুটো বোতামের একটায়, দুই সেকেন্ড পর দ্বিতীয়টায়।

পরপর দু'বার কেঁপে উঠল মোবাইল গার্ল কামানের প্রচণ্ড রিকয়েলের ফলে। মুহূর্তে মিসমার হয়ে গেল স্পীডবোট দুটো। এই ছিল, এই নেই—একেবারে নিশ্চিহ্ন। দপ্ করে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্বলে উঠেই মিলিয়ে গেল সাগরগর্ভে। মাহমুদ বেগ সিটির দিকে রওনা হতে গিয়ে আবার চমকে গেল রানা।

এতক্ষণ স্পীডবোট দুটো নিয়ে ব্যস্ত থাকায় লক্ষ্যই করেনি সে, ডানদিক থেকে একেবারে গায়ের কাছে চলে এসেছে একটা হাইড্রোফয়েল। গতিবেগ কম করে হলেও আশি নট। রানাকে ঘুরতে দেখেই শুরু হলো গোলাবর্ষণ।

মোবাইল গার্লের স্পীড এখন দশ নট। যত শক্তিশালী ইঞ্জিনই হোক না কেন, স্পীড তুলতে সময় লাগবে। হাইড্রোফয়েলের হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন উপায় আছে বলে মনে হলো না রানার কাছে। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। গোক্ষুরের মত ছোবল দিল রানার হাত। ডিজেল ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে একটা চাবি ঘুরিয়েই টিপে দিল সে জে ৪৬ স্টার্ট লেখা একটা বোতাম।

গম্ভীর একটা গর্জন কানে এল রানার। একটা সবুজ বাতি জ্বলে উঠল প্যানেলে—অর্থাৎ, ঠিকমতই চালু হয়ে গেছে টার্বো জেট। স্ট্যাবিলাইজার ফিনের বোতাম দুটো টিপে দিয়েই আরেকটা বোতাম টিপল রানা। এর ফলে ডেকের ওপর বেরিয়ে আসবে ·৫০ ক্যালিবার ব্রাউনিং মেশিনগানের নল। লাল একটা বোতাম টিপে দিতেই শুরু হয়ে গেল গুলিবর্ষণ। সঙ্গে সঙ্গেই

ইলেকট্রোম্যাগনেটিক গিয়ারটা স্লো অ্যাহেড-এ দিল রানা বাঁ হাতে। চলতে শুরু করল ক্রুজার।

মোবাইল গার্ল যে ঠিক কত দ্রুত স্পীড তুলবে জানা না থাকায় টার্বোজেট চালু হতে দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে সাতান্ন মিলিমিটার রিকয়েললেস রাইফেল চালু করল ওরা। ওদের লক্ষ্যস্থল টার্বোজেট। প্রথম গুলিটা মিস হয়ে গেল। ছিটকে উঠে এল সাগরের জল ডেকের ওপর।

ফুল অ্যাহেড-এ দিল রানা গিয়ার শিফট। কেঁপে উঠল মোবাইল গার্ল। ছুটতে শুরু করেছে সামনে। ক্রমেই বাড়ছে গতি। কিন্তু যে হারে বাড়ছে তাতে কোন লাভ নেই। দ্রুতহাতে শেষ বোতামটা টিপল রানা। ফিশিং সীটের নিচ দিয়ে সড় সড় করে পানিতে গিয়ে পড়তে শুরু করল ছোট ছোট ক্যানেস্তারার মত ম্যাগনেশিয়াম চার্জ। পানিতে পড়েই টুপ করে ভেসে উঠছে ওগুলো ছিপের ফাৎনার মত।

রিকয়েললেস রাইফেলের দ্বিতীয় গুলি মড়মড় করে মোবাইল গার্লের ছাতের খানিকটা অংশ ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেল। হুহু করে বাড়ছে স্পীড। ডায়ালের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছে রানা। সবুজ কাঁটা যখন পাঁচ হাজার হর্স পাওয়ারের ঘর স্পর্শ করল, স্পষ্ট অনুভব করল সে সামনের দিকটা শূন্যে উঠে গেছে মোবাইল গার্লের। মনে হচ্ছে, এক্ষুণি পানি ছেড়ে উড়াল দেবে রাজহাঁসের মত। দ্রুত ডানদিকে সরে যাচ্ছে স্পীডমিটারের কাঁটা।

দপ্‌ করে জ্বলে উঠল তীব্র আলো। ঝট করে পেছন ফিরল রানা। জ্বলে উঠেছে নীলচে-সাদা ম্যাগনেশিয়াম আলো। পরমুহূর্তে পর পর দুটো কমলা রঙের বিস্ফোরণ দেখতে পেল সে, সেই সঙ্গে বজ্রপাতের মত বিকট শব্দে তালা লেগে গেল কানে। চোখের সামনে হাইড্রোফয়েলের অ্যালুমিনিয়াম বডি প্রচণ্ড উত্তাপে তেলাপোকার শুঁড়ের মত কুঁকড়ে যেতে দেখল রানা। উন্মাদের মত লাফালাফি করছে ওর ভিতর কয়েকজন। আবার একটা বিস্ফোরণে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল সব। সাগরের নিচে অদৃশ্য হয়ে যেতেই দপ করে নিভে গেল সব আলো। শুধু মাতালের মত দুলছে চাঁদের প্রতিবিম্ব সাগর জলে।

মস্ত এক অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করে ফিরে চলল রানা মাহমুদ বেগ সিটির দিকে। অফ্‌ করে দিল টার্বোজেট। বিকেলে যেখানে নোঙর ফেলেছিল, ঠিক সেইখানেই আবার নোঙর ফেলল সে। এবার আর বোট হাউসের ভিতর ঢুকল না। বালুকা বেলাতে দাঁড়িয়েই প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে শুকনো জামাকাপড় আর ওয়ালথার পি. পি. কে. বের করল। তৈরি হয়ে নিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে রওনা হলো সিটির দিকে। চোখ-কান সজাগ সতর্ক, কিন্তু অতি গোপনীয়তা অবলম্বন করে সময় নষ্ট না করাই সমীচীন বলে মনে হলো ওর।

কেননা, পরিষ্কার বুঝতে পারছে, হাতে সময় খুবই কম। উপলব্ধি করতে পারছে, শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় পিছিয়ে রয়েছে সে অনেক।

নয়

রাস্তায় একটা লোকও দেখতে পেল না রানা।

একেবারে নিঝুম, নিস্তব্ধ। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোও মনে হচ্ছে জনশূন্য। কারও গলার আওয়াজ তো দূরে থাকুক একটা রেডিও বা টেলিভিশন সেটের শব্দও পেল না সে। ব্যাপার কি? ভাগল নাকি সব? গেল কোথায়?

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটাকে একটু বেশি মাত্রায় লাফালাফি করতে দেখে বুঝতে পারল রানা, ভয় পেয়েছে সে। এক দৌড়ে কেবিন ক্রুজারে ফিরে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছেটা দমন করল সে। ট্রিসাকে মাইলখানেক দূরের একটা নির্জন বীচে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখে এসেছে, কাজেই সে ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা নেই। রানার অনুপস্থিতির সুযোগে যে কেউ মোবাইল গার্লে উঠে ওর জন্যে ওৎ পেতে অপেক্ষা করবে সে পথও বন্ধ করে দিয়ে এসেছে সে নামার সময়। একটা গোপন ইলেকট্রিক সার্কিট না কেটে কেউ যদি কেবিন ক্রুজারে উঠবার চেষ্টা করে, বিস্ফোরণ ঘটবে একটা পঁচিশ পাউন্ড আর ডি এক্স চার্জে। কাজেই সেদিক দিয়েও চিন্তা নেই। কিন্তু যার সঙ্গে দেখা করতে চলেছে তার দেখা কি পাবে সে? প্রফেসার ব্র্যান্ডকেও সরিয়ে ফেলা হয়নি তো?

ট্র্যাপ। নিশ্চয়ই কোন ফাঁদ পাতা হয়েছে ওর জন্যে। প্রফেসার ব্র্যান্ডের বাড়ির সামনের লন থেকে সাঁৎ করে একটা ছায়ামূর্তিকে সরে যেতে দেখল রানা। নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটের কোণে। প্রাচীর ডিঙিয়ে ভিতরের আঙিনায় নামল সে। একটা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে পর্দাটা সামান্য একটু সরিয়েই স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। না। সরিয়ে নেয়া হয়নি প্রফেসার ব্র্যান্ডকে। ঘরটা অন্ধকার। একটা টিভির পর্দার আলোতে দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধের মুখটা, তার পাশে একটা শেল্‌ফ্‌ ঠাসা মোটা বাঁধানো বইয়ের সারি। হুইল চেয়ারে বসে সামনে ঝুঁকে চেয়ে রয়েছে প্রফেসার টিভির দিকে। কি দেখা যাচ্ছে ওখানে? রানার দেয়াল ডিঙিয়ে বাড়িতে ঢোকার দৃশ্য? আরেকটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে টিভি প্রোগ্রাম। পর্দা তুলে দেখা গেল ঘোষকের মুখ। রেগুলার প্রোগ্রামই তাহলে। কিন্তু প্রফেসারের চরিত্রের সঙ্গে এত গভীর মনোযোগ দিয়ে টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখাটা তেমন খাপ খাচ্ছে বলে মনে হলো না ওর। প্রফেসার ব্র্যান্ড···হঠাৎ শিরশির করে উঠল রানার শিরদাঁড়ার ভিতর ঠাণ্ডা একটা উত্তেজনার স্রোত।

কবির চৌধুরী!

টেলিভিশন সেটের পর্দায় আচমকা এই চেহারা দেখবে কল্পনাও করতে পারেনি রানা। বেশিক্ষণ না, বিশ সেকেন্ড পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল মুখটা অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কয়েকটা কথা বলেই। পর্দা ব্ল্যাংক। বাড়ির পেছন দিকে চলে এল রানা। ওর মাথার মধ্যে ঘুরছে ব্রেন ওয়াশের কথা। নিশ্চয়ই টেলিভিশনের মাধ্যমে ব্রেন ওয়াশ করছে কবির চৌধুরী প্রফেসারের। বাইরে থেকে একপাক ঘুরল রানা বাড়িটার চারপাশ। প্রত্যেকটা দরজা জানালা বন্ধ। ফিরে এল পেছন দিকের একটা ড্রেন পাইপের কাছে। একটু টেনে ওটার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়ে উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। ডানদিকে ঝুঁকে ইস্পাতের ফলাটার সাহায্যে দু'মিনিটের চেষ্টায় খুলে ফেলল সে একটা বন্ধ জানালা। নিঃশব্দে ঢুকল রানা ঘরের ভিতর। কেউ নেই। দোতলার প্রত্যেকটা কামরা ঘুরে ফিরে দেখল সে। কেউ নেই। পুরু কার্পেট বিছানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। সামনেই হলঘর। প্রফেসারের পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। তেমনি ঝুঁকে বসে আছেন টেলিভিশনের দিকে চেয়ে। কয়েক পা এগিয়েই ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার। আরে! বাইরের রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে এখন টেলিভিশন পর্দায়। স্বল্পালোকিত জনশূন্য রাস্তা। যা ভেবেছিল তাই—প্রহরার ব্যবস্থা নেই, কারণ যান্ত্রিকভাবে টের পাচ্ছে ওরা ওর গতিবিধি।

আর দু'পা এগিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পাঁই করে পিছন দিকে ঘুরল রানা। সেই ভোঁতা চেহারার লোকটা। দেয়ালে টাঙানো একটা একহাত লম্বা কুঠার খসিয়ে আনছে সে বামহাতে। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। কুঠারটা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই একলাফে পৌঁছে গেল রানা। নিঃশব্দে ঢুকে গেল স্টিলেটো লোকটার বামহাতের নিচ দিয়ে সোজা হৃৎপিণ্ড বরাবর। কেঁপে উঠল লোকটার শরীরটা। জোরে এক ঝাঁকুনি খেয়ে; ঝট করে ঘাড় ফেরাল পেছন দিকে—এতই জোরে যে কড়াৎ করে হাড় ফুটল ঘাড়ের কাছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে রইল লোকটা তিন সেকেন্ড। হাত থেকে কুঠারটা পড়ল আগে, তারপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল সে হাঁটু মুড়ে উপাসনার ভঙ্গিতে। ততক্ষণে ফলাটা বের করে মুছে নিয়েছে রানা কোটের পিছনে।

'প্রফেসার ব্যান্ড!' ঝট করে ফিরল রানা। 'আপনার কোন···' মুখের কথা মুখেই আটকে গেল রানার। মুহূর্তে বুঝতে পারল নিজের ভুল। প্রফেসার যে স্বেচ্ছায় কবির চৌধুরীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে, এই কথাটা একবারো মনে আসেনি ওর। ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন সেট দেখছে—এর পরেও ব্যান্ডকে শত্রুপক্ষের লোক বলে ভাবতে পারেনি সে, কবির চৌধুরীর ছবিটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে দিয়েছে ওর মনে যে প্রফেসারকে ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছে। আসলে ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছিল না ওর, পরবর্তী কমপন্থা কি হবে সেই আদেশ দেয়া হচ্ছিল। ঢাকার হেড কোয়ার্টারে ওর কার্ড ফাইলটা এবার লাল ক্রস চিহ্ন দিয়ে সম্মানের সঙ্গে তুলে দেয়া হবে অতীতের তাকে—সে ব্যাপারে

সন্দেহ নেই রানার মনে।

প্রফেসারের হাতে ধরা ছড়িটার দিকে চেয়ে রইল রানা, ছড়িটাও চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। ছড়ির মাথায় পরানো সাইলেন্সার পাইপটা চিনতে ভুল হলো না ওর। ওটা একটা রাইফেল।

'রেমিংটন সেভেন টোয়েন্টি ওয়ানের ব্যারেল,' মৃদু হেসে বলল ব্র্যাড। 'দুটো ·৩০০ ম্যাগনাম কার্ট্রিজ পোরা রয়েছে এতে।'

'হাতি শিকারের জন্যে চমৎকার।' নরম গলায় বলল রানা। আরও কিছু কথা শুনতে চায় সে ব্র্যান্ডের মুখ থেকে।

'কোণে গিয়ে দাঁড়াও!' ধমকে উঠল ব্র্যাড। 'দেয়ালের দিকে মুখ করে।'

খটকা লাগল রানার মনের মধ্যে। বিকেলে ঠিক এই গলায় তো কথা বলেনি প্রফেসার। স্বরে শুধু নয়, সুরেও সামান্য তফাৎ আবিষ্কার করল সে। কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বাড়াবার চেষ্টা করল।

'আমাকে যদি মেরে ফেলেন কিংবা দেরিও যদি করিয়ে দেন, মারা পড়বে আপনার মেয়ে। এবং সেজন্যে দায়ী থাকবেন আপনি নিজেই।'

আড়চোখে চেয়ে দেখল রানা, কোন প্রতিক্রিয়া নেই প্রফেসারের চেহারায়। ছড়িটা তেমনি ধরে রেখে একহাতে হুইল ঘুরিয়ে এগিয়ে আসছে। পা থেকে কোমর পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। হুইল ছেড়ে দিয়ে কম্বলের নিচ থেকে একজোড়া হ্যান্ডকাফ বের করে আনছে সে। 'হাত-দুটো পিছন দিকে নিয়ে এসো।'

হাত পিছনে নিল রানা ঠিকই, কিন্তু যেই প্রফেসার হ্যান্ডকাফটা ওর হাতে পরাবার উপক্রম করল, অমনি হুইলচেয়ারের ফুটরেস্টের নিচে পা বাধিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল ওপর দিকে। দুপ করে একটা ভারী আওয়াজ বেরোলো ছড়ির মুখ থেকে। ঝুরঝুর করে দু'জনের মাথার ওপর খসে পড়ল চুন-সুরকি ছাত থেকে। মেঝের ওপর ধড়াস করে উল্টে পড়ল হুইল চেয়ার। পাই করে ঘুরেই ডাইভ দিল রানা। চেয়ারটা উল্টে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে বোঝা গেল পঙ্গু তো নয়ই, রীতিমত বলিষ্ঠ লোকটা।

ছড়িটা রানার দিকে লক্ষ্য করে ধরার আগেই পৌঁছে গেল রানা, এক হাতে ব্যারেল ধরে শুয়ে শুয়েই প্রচণ্ড এক লাথি চালাল লোকটার পায়ের কব্জি লক্ষ্য করে। গোড়া থেকে কেটে দেয়া কলাগাছের মত দড়াম করে পড়ল লোকটা মেঝের ওপর ছড়িটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা, ছড়ির বাঁট দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে মারল লোকটার মাথার পেছনে। হেয়ার ট্রিগার—নিশ্চয়ই অ্যাডজাস্টমেন্টে কোন গোলমাল ছিল, ঝাঁকি খেয়ে দুপ করে ছুটে গেল দ্বিতীয় গুলিটা, তাপ অনুভব করল রানা হাতে, ঠুস করে একটা জানালার কাঁচ ভেদ করে বেরিয়ে গেল গুলি। দ্বিতীয়বার ছড়িটা ব্যবহার করতে গিয়েও থেমে গেল সে। মনে হচ্ছে একটাতেই কাজ হয়ে গেছে। পাঁজরের ওপর জোরে একটা লাথি মেরে দেখল, নড়ে না। পাশে বসে

চিবুকের কাছে নখ বসিয়ে দিয়ে চড়চড় করে টেনে তুলে ফেলল সে মুখোশটা। বুড়ো মানুষের ভাঁজ ভাঁজ মুখ, যে কেউ একবাক্যে বলবে লোকটার বয়স সত্তরের কম না—কিন্তু শরীরটা সতেজ এক যুবকের। প্লাস্টিক সার্জারি।

ব্যাপারটা কি? এমন কি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেমেছে এবার কবির চৌধুরী, যার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার এবং অর্থব্যয়কে আতিশয্য বলে মনে হচ্ছে না ওর কাছে? এত প্যাঁচ আর এত কর্মকাণ্ডের পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা কি? এরা সব গেলই বা কোথায়? চেহারাটা একবার দেখিয়েই ডুব দিয়েছে কবির চৌধুরী। কেন?

দরজা জানালা বন্ধ করে সার্চ শুরু করল রানা। সারা বাড়িতে প্রফেসার ব্র্যান্ড, বা ডক্টর ক্লিদারো বা আর কারও কোন পাত্তা নেই। রানার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখে সরে গেছে ওরা। টিভির চ্যানেল এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখল সে, শুধু একটা চ্যানেলই ক্লোজড সার্কিট, বাকিগুলো সাধারণ আর দশটা টেলিভিশনের মতই।

দোতলার একটা ঘরে গোপন ক্যামেরা দুটো পেল রানা, ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ডের ফাঁক দিয়ে ছবি তুলছে রাস্তার। সিঁড়ির নিচে একটা তালা মারা ছোট্ট কুঠুরিতে পাওয়া গেল একটা ফটোগ্রাফিক ডার্করুম। নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে সব যন্ত্রপাতি। সিংক, ওয়াশ-বেসিন তো রয়েছেই, ফিল্ম ডেভেলপার, ফটোগ্রাফিক পেপার, এনলার্জার, মাইক্রোডট ইকুইপমেন্ট, শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ, এবং কয়েক ধরনের ক্যামেরা রয়েছে ওয়ার্কিং টেবিলের ওপর। একটা দেয়াল-আলমারি খুলেই ছোট্ট শিস দিল রানা। রেডিও ট্র্যান্সমিটার। আলমারির ডালাটা খুলতেই একটা যন্ত্রের কাঁটা দুলে ওঠায় সেটার দিকে চোখ গিয়েছিল রানার, চারপাশে ঘুরে ফিরে এল দৃষ্টিটা সেই ডায়ালের ওপর। একশোর ঘরে স্থির হয়ে রয়েছে কাঁটা।

চিনতে পারল রানা যন্ত্রটা। এটা একটা আর ডি এফ। ট্র্যানজিস্টা-রাইজড়। সোজা ভাষায় বিশেষ কিছুর অবস্থান জানার জন্যে দিক-নির্ণয় যন্ত্র। বিশেষ কোন রেডিও সিগন্যাল পেলে সেটা কোন্ দিক থেকে এবং কতদূর থেকে আসছে বের করে ফেলা যাবে ডায়ালের দিকে চাইলে।

সুইচ অন করতে গিয়ে দেখল রানা অন্ করাই আছে ওটা। বীকনটা কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করল সে চার্ট দেখে। প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারল না রানা। ব্যাপারটা কি? কাঁটার অবস্থান দেখে বোঝা যাচ্ছে এই বাড়ি থেকেই আসছে সিগন্যাল। এক পা পিছিয়ে গিয়েই বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখজোড়া। একটা ডায়ালের কাঁটা নেমে এল একশোর ঘর থেকে নব্বইয়ের ঘরে। আবার সামনে এগোতেই উঠে গেল একশোর ঘরে। কোন সন্দেহ নেই আর! রানা নিজেই বীকন!

বিদ্যুৎ চমকের মত এক ঝলকে সবটা ব্যাপার বুঝে ফেলল রানা। নিমেষে পেয়ে গেল অনেক প্রশ্নের উত্তর। বুঝতে পারল কিভাবে ওকে অনুসরণ করে

বিকেলে বোটহাউসে পৌঁছেছিল বেগ সিটির তাগড়া-জোয়ান বৃদ্ধরা। ডক্টর নিমেরী ফ্লেচারের ছদ্মবেশ ভেদ করে রানার আসল পরিচয় জেনে ফেলতে কেন ওদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি, কেন কোটিপতি ক্রফোর্ড যখন বোটহাউস থেকে বেরোল, এক সেকেন্ড দ্বিধা না করে তাকেই আক্রমণ করে বসল ওরা। এখন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে এক্স এল ফ্লুইড রয়ে গেছে ওর শরীরে রক্তের সঙ্গে। রানার অবস্থান ও কার্যকলাপ ওদের নখদর্পণে। ওয়াকিং টার্গেট!

আপাতত এ ব্যাপারে ওর করবার কিছুই নেই। আরেক দেয়ালে বসানো একটা ক্যাবিনেটে পাওয়া গেল মেকাপের সাজ সরঞ্জাম। অনেকগুলো মুখোশ রয়েছে এক পাশে। একেবারে জীবন্ত মানুষের মুখ মনে হয় দেখলে। একটা মুখোশ দেখে চমকে উঠল সে। একেবারে ওর নিজের চেহারা! কি করতে চায় ওরা রানার ছদ্মবেশ নিয়ে?

সব কিছুর একটা করে নমুনা সংগ্রহ করার প্রয়োজন বোধ করল রানা। পকেট থেকে একটা ওয়াটার-প্রুফ প্লাস্টিক ব্যাগ বের করে টপাটপ তুলে নিল যেটা যেটা পছন্দ। ফিরে এল ব্যান্ডের বেডরুমে। একটা ব্যুরো ড্রয়ারে গোটা কয়েক চিঠি পাওয়া গেল—কোনটা বৈজ্ঞানিক বন্ধুর, কোনটা ট্রিসার লেখা। এগুলো ব্যাগে পুরে ড্রয়ারটা বের করে মেঝের ওপর রাখল রানা। ফাঁকা জায়গায় যতদূর যায় হাত ঢুকিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই একটা কাগজ বাধল হাতে—টেবিলের গায়ে সেলোটেপ দিয়ে আটকানো। ছোট একটুকরো কাগজ, তার উপর আঁকাবাঁকা হাতে লেখা রয়েছে কোন সেফের কমবিনেশন।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে চাইল রানা। নিশ্চয়ই কোন ছবির পিছনে পাওয়া যাবে সেফটা। চার দেয়ালের চারটে ছবি সরিয়ে পাওয়া গেল না কিছুই। ঘরের আসবাব সরিয়ে, জায়গায় জায়গায় কার্পেট তুলে দেখল—নাহ্, নেই। এবার খাটটা টেনে সরিয়ে আনল রানা দেয়াল থেকে কয়েক ফুট দূরে, তারপর ব্যুরোটা সরাতেই চোখে পড়ল ওর সেফটা। এক হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল সে আয়রন সেফের সামনে।

প্রথমেই এল এক বান্ডিল কাগজপত্র, তারপর অসংখ্য ছবি ঠাসা একটা বড়সড় ম্যানিলা এনভেলপ। সব পুরানো, হলদেটে রঙ। চিঠিপত্রের তারিখ দেখে বোঝা গেল সবগুলোই ঊনচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ সালের মধ্যে লেখা, ছবিগুলো নানান ধরনের—কোনটা কনফারেন্সের, কোনটা হিটলারের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণের, কোনটা ফ্যামিলি গ্রুপ—স্বস্তিকা আর জ্যাকবুটের ছড়াছড়ি। ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল রানা ওগুলো। তারপর টেলিভিশন সেটটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে পেছন দরজা দিয়ে।

মোবাইল গার্লকে অক্ষত অবস্থায় ভাসতে দেখে একটু অবাকই হলো সে। সাবধানে ডিনামাইটটা ডিসকানেক্ট করে উঠে পড়ল ডেকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল সে ঝোপঝাড় ছাওয়া সেই নির্জন বীচে। যেমন রেখে গিয়েছিল ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে ট্রিসা কম্বল ঢাকা

অবস্থায়। শিশুর মত নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখে কেমন যেন মায়া লাগল রানার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান করল সে নিজেকে—তুমি জানো না ও সত্যি সত্যিই মাইকেল কলিনকে খুন করেছে কিনা, তবে তোমাকে যে লোভ দেখিয়ে নির্জন বীচে নিয়ে গিয়ে মরগ্যানের হাতে তুলে দিয়েছিল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই সাবধান!

ট্রিসার ঘুমন্ত দেহটা পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়ার আগে ওর চিবুকের কাছটা ভালমত আঙুল বুলিয়ে দেখে নিল রানা। মুখোশের ছড়াছড়ি দেখে কে ঠিক কে বেঠিক সে ব্যাপারে বেদিশা হয়ে পড়েছে সে একেবারে। নকল নয়, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে ওকে তুলে নিয়ে ফিরে এল সে মোবাইল গার্লে।

রাতটা খোলা সমুদ্রে কাটানোই নিরাপদ মনে করল রানা। ট্রিসাকে ডেকে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিয়ে কাছেই ককপিটের একটা চেয়ারে বসে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখল সারাটা রাত। একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করল, আর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করল গোটা ব্যাপারটাকে।

ঠিক ভোর ছ'টায় সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করল রানা ফিলিপ কার্টারেটের সঙ্গে। প্রতিটি ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করল বিশদভাবে। এটাই নিয়ম—হঠাৎ কোন কারণে অ্যাকটিভ এজেন্টের মৃত্যু ঘটলে যেন কাজ বন্ধ না হয়ে যায়, যেন আরেকজনকে বদলি হিসেবে পাঠাতে কোন অসুবিধে না হয়।

রিপোর্টের মাঝপথেই হঠাৎ বাধা দিয়ে কথা বলে উঠলেন ফিলিপ কার্টারেট।

'তোমার রিপোর্ট পরে শুনছি, রানা। এইমাত্র একটা মেসেজ এসেছে সোহানা চৌধুরীর কাছ থেকে। পড়ছি, শোনো।' তিন সেকেন্ডের বিরতি, তারপর পিলে চমকে দেয়া খবর ভেসে এল বৃদ্ধের কণ্ঠে: 'ট্র্যান্সমিশন ৫০৯৭-এস। সকাল পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিট। সোহানা চৌধুরী রিপোর্ট করছেন, এই কিছুক্ষণ হলো ফিরে এসেছে প্যাট্রিসিয়া ব্ল্যান্ড লি-বিউসে প্রজেক্টে কাজে যোগ দেবে বলে।'

সাধারণত কোন ব্যাপারে হকচকিয়ে যাওয়া রানার স্বভাব বিরুদ্ধ। যদি যায়ও, ওর মুখ দেখে সেটা বুঝবার সাধ্য খুব কম লোকেরই আছে—এমনই কন্ট্রোল ওর নিজের ওপর। কিন্তু এই মুহূর্তে উড়ে গেল সব কন্ট্রোল। দেখতে দেখতে হাঁ হয়ে গেল রানার মুখটা। বারকয়েক বিস্ফারিত চোখে চাইল সে একবার শর্টওয়েভ রেডিও সেটের, আর একবার ঘুমন্ত ট্রিসার দিকে।

প্যাট্রিসিয়া ব্ল্যান্ড যদি লি-বিউসেতে থাকে তাহলে এই মেয়েটা কে!

দশ

নড়ে উঠল ইজিচেয়ারে শোয়া মেয়েটা। সামনে ঝুঁকে এল রানা। চোখ খুলেই রানাকে দেখে চমকে উঠল সে। জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'তার আগে তুমি কে বলো দেখি, সুন্দরী? কে তুমি?'

জল এসে গেল মেয়েটার চোখে। বাচ্চা মেয়ের মত ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'মেইন নেইম ইস্ট ট্রিসা। আইখ হ্যাব মিখ ভারলফেন...' গড় গড় করে বলে যেতে থাকল সে। 'আমার নাম ট্রিসা। হারিয়ে গেছি আমি। আর সবাই মরে গেছে। এদিকে আমেরিকান সোলজার দেখেছ? মেরে ফেলবে ওরা আমাকে, বাঁচাও।'

এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, বুঝতে পারল রানা। বিস্ফোরণের জোর ধাক্কা খেয়ে অতীতে চলে গেছে মেয়েটা। একেবারে বাল্য জীবনে। তখনকার কোন বিশেষ স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে। অভিনয় যে করছে না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে একটা ইঞ্জেকশন দিল সে মেয়েটার বাম বাহুতে। ঘুমিয়ে পড়তেই পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিয়ে এল নিচের বাংকে।

গভীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে রানা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর আসবে প্যারিস থেকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে চারপাশে চাইল সে। সাগর ছেড়ে মাত্র দশ-বারো হাত উঠেছে সূর্যটা, আয়নার মত স্বচ্ছ জলে চোখ-ধাঁধানো প্রতিফলন। আবার সোহানা চৌধুরীকে কন্ট্যাক্ট করে বিশেষ কয়েকটা তথ্য সংগ্রহ করবার অনুরোধ জানিয়েছে সে ফিলিপ কার্টারেটের কাছে। ততক্ষণে কি কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখবে সে? সিসির কাছাকাছি কোথাও ফেলবে নোঙর? চল্লিশ মাইল দূরে আছে সে এখন, কিন্তু মনটা কেন জানি টানছে সিসির দিকেই। মন বলছে, মস্ত কোন ঘাপলা রয়েছে ওই অ্যাকোয়াসিটিতে, ওইখানেই আড্ডা গেড়েছে এবার কবির চৌধুরী। এত কড়া পাহারার ব্যবস্থা যখন, নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু পাকিয়ে উঠেছে সিসির আশপাশেই।

ছোট্ট একটা কাশি দিয়েই চালু হয়ে গেল মোবাইল গার্লের টুইন ডিজেল ইঞ্জিন। ধীর গতিতে এগোল সিসির মাইল চারেক দূরের ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপগুলো লক্ষ্য করে।

প্রফেসার ব্র্যান্ডের ব্যাপারটা রহস্যজনক। লোকটাকে সত্যিই ব্রেন ওয়াশ করা হচ্ছে, নাকি সে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করছে কবির চৌধুরীর সঙ্গে বুঝে নেয়া দরকার মনে করে আয়রন সেফ থেকে সংগ্রহ করা ছবি আর কাগজপত্রগুলো ঘেঁটেছে সে এতক্ষণ। কিন্তু পরিষ্কার হচ্ছে না কিছুই। গোটা কয়েক নক্সা পাওয়া গেছে পানির নিচ দিয়ে কিভাবে আক্রমণ করে ইংল্যান্ডকে পরাস্ত করা যায় তার। এত বছর পরও এটা আয়রন সেফে লুকিয়ে রাখবার কি অর্থ? এটা কি সেই পুরানোটা, নাকি নতুন করে আঁকা হয়েছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে? যেসব আন্ডারওয়াটার যন্ত্রপাতির উল্লেখ দেখা যাচ্ছে—স্লেড, ট্র্যাকটর, টু-ম্যান সাবমেরিন—এসবের যন্ত্রাংশ এবং এর সবগুলোর প্রিন্সিপল্ যে ছেচল্লিশ সালের আগে আবিষ্কার হয়নি সে ব্যাপারে রানা নিশ্চিত।

ছবিগুলোতেও যে রকম সাফল্যের আত্মতৃপ্ত হাসি দেখা যাচ্ছে, তাতে লোকটার সম্পর্কে কোন পরিষ্কার সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

প্রবাল দ্বীপের আড়ালে আড়ালে অতি সাবধানে শম্বুক গতিতে যতটা সম্ভব কাছে চলে এল রানা সিসির। আর সামনে এগোলেই রাডারে ধরা পড়ে যাবে সে। শেষ দ্বীপটার আড়ালে থেকে দাঁড়িয়ে নোঙর ফেলল। পানির নিচ দিয়ে চার মাইল সাঁতার কাটবার কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। কিন্তু উপায় নেই। অলক্ষ্যে ওই এলাকার কাছাকাছি যাওয়ার আর কোন রাস্তা নেই।

সিগন্যাল পেয়ে শর্ট ওয়েভ রেডিওর সামনে এসে বসল রানা। ফিলিপ কার্টারেট।

'সোহানার কাছ থেকে আবার মেসেজ এসেছে, রানা। লি-বিউসে ইনস্টলেশনে ঠিক পাঁচটা পঞ্চাশে উপস্থিত হয়েছে প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ড। তোমার কথা মত ছ'টা দশে আমরা সোহানাকে নির্দেশ দিই ভালভাবে চেক করে দেখতে। সিকিউরিটি চীফ মেজর ফ্র্যান্সিস সালিভ্যান এবং ডক্টর ট্যালবটকে জানানো হয়েছে তোমার সন্দেহের কথা। ফলে থরো মেডিক্যাল চেকাপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সামান্য ছুতো ধরে। রি-ওরিয়েন্টেশন সেশনে অলক্ষ্যে উপস্থিত ছিল সোহানাও। কোথাও কোন খুঁত নেই। সিকিউরিটি অফিসার, সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সোহানা—তিনজনেই একটা ব্যাপারে একমত হয়েছে: এই মেয়েটা আসলেই প্যাট্রিসিয়া ব্র্যান্ড।'

কয়েক সেকেন্ড ভ্রূ কুঁচকে রেখে অনেকটা আপন মনেই বলল রানা, 'মনে হচ্ছে দু'জনেই আসল।'

'অর্থাৎ?' ক্যাক করে চেপে ধরলেন ফিলিপ কার্টারেট। 'পরিষ্কার বোঝা গেল না মন্তব্যটা। তুমি কি ব্যঙ্গ…'

কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল বেগে চালু হয়ে গেছে রানার মস্তিষ্ক। কি যেন আর একটু স্পষ্টতর হওয়ার জন্যে খোঁচাচ্ছে রানার মনের ভিতর। কোন একটা চিঠির একটা লাইন, কোন একটা ছবির একটা অংশ, কোন একটা ঘটনা, অস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত— ধীরে ধীরে এর সঙ্গে ওর মিল খুঁজে পেয়ে আলাদা একটা ছবি ফুটে উঠেছে রানার মানস-পটে।

'ব্যঙ্গও নয়, সর্পও নয়, পাঁচটা মিনিট সময় দিন আমাকে চিন্তা করবার। আমিই কন্ট্যাক্ট করব আপনাকে! ওভার অ্যান্ড আউট।'

দ্রুতহাতে খুঁজে বের করল রানা ছবিটা। ওটার দিকে একনজর চেয়েই বুঝতে পারল সে কবির চৌধুরী বা ক্লিদারোর কাছ থেকে আড়াল করবার জন্যে রাখা হয়নি এগুলো গোপন সেফে। আসলে ট্রিসার কাছ থেকে আড়াল করতে চেয়েছে প্রফেসার ব্র্যান্ড এসব।

ছবিটা হিটলারের প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের একটা গেট-টুগেদার পার্টিতে তোলা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ। একটা রৌদ্রোজ্জ্বল ব্যালকনিতে কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। পেছনে দেখা যাচ্ছে তুষার ঢাকা আল্পসের

গিরিশৃঙ্গ। ছবিতে প্রফেসার ব্র্যান্ডকে খুঁজে বের করল রানা। সবার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উদাসীন, বিমর্ষ চেহারা। কালো একটা আর্মব্যান্ড দেখে অনায়াসে বোঝা যায় তার মন খারাপের কারণটা। এয়ার রেইডে মারা গেছে তার স্ত্রী কদিন আগে। কাছেই আড়াই বছরের ট্রিসা দাঁড়িয়ে। খুশিতে উদ্ভাসিত ওর মুখটা, চকচক করছে চোখ জোড়া, দুঃখের লেশমাত্র নেই চেহারার কোথাও। প্রথম দর্শনে আবছাভাবে খটকা লেগেছিল, এবার ভাল করে দেখল রানা ছবিটা। সত্যিই কি মেয়েটা ব্র্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে? না তো। পাশের পরিবারটারই বেশি কাছে রয়েছে মেয়েটা। কম করে হলেও একফুট এদিক ঘেঁষে রয়েছে।

মোটাসোটা অথচ সুন্দরী এক মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশ ফিরে। আশ্চর্য মিল খুঁজে পেল রানা ট্রিসার সঙ্গে সেই মহিলার চেহারায়। দুজনেই স্বর্ণকেশী। মহিলার পাশে দাঁড়ানো চশমা পরা লম্বা লোকটাকে চিনতে একটুও কষ্ট হলো না রানার। প্রফেসার লটেনবাক। তার প্যান্টের পায়ের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটা মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। উঁকি দিচ্ছে মেয়েটা হাসিমুখে ট্রিসার দিকে। অবিকল ট্রিসার চেহারা!

মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে সবটা ব্যাপার। যমজ! প্রফেসার লটেনবাকের যমজ মেয়ে এ দুজন!

সেই অশুভ বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। হিটলারের দক্ষিণ হস্ত—প্রফেসার লটেনবাক। সবার ধারণা ছিল ফুয়েরারের সঙ্গে বার্লিন বাংকারে মারা গিয়েছিল লটেনবাকও। কিন্তু একে দেখেছিল রানা রাঙামাটির সেই ধ্বংস-পাহাড়ে গবেষণারত কবির চৌধুরীর ডান-হাত হিসেবে। পাহাড়টা ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার পর সবাই ধরে নিয়েছিল মারা পড়েছে ভিতরের প্রত্যেকে, নিশ্চয় করে বলার উপায় ছিল না কিছুই। কে জানে, বলা যায় না, হয়তো আজও বেঁচে আছে সেই পিশাচটা।

রানার মাথার মধ্যে খাঁজে খাঁজে মিলে যেতে থাকল তথ্যের পর তথ্য। ট্রিসার টুকরো কথা, প্রফেসার ব্র্যান্ডের চিঠিতে দুই এক লাইনে অতি অস্পষ্ট আভাস, অন্যান্য ডকুমেন্ট থেকে পাওয়া আবছা ইঙ্গিত—সবকিছুরই অর্থ পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন। বোঝা যাচ্ছে: সরাসরি বাংকারের ওপর পড়েছিল একটা বোমা, ছিটকে দূরে গিয়ে পড়েছিল ট্রিসা, আগুন ধরে গিয়েছিল বাংকারে, ওর বাবা আর বোন ফ্রলিন আটকে গিয়েছিল ভিতরেই। নিশ্চয়ই অন্য বাংকারের সঙ্গে যোগ ছিল এই বাংকারের, গোপন পথ দিয়ে সরে গিয়েছিল লটেনবাক হয় ফুয়েরার নয়তো মর্টিন বোরম্যানের বাংকারে।

এদিকে অতটুকু বাচ্চা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ছোটাছুটি করেছে বার্লিনের রাস্তায়, সাহায্য চেয়েছে এখানে ওখানে। প্রফেসার ব্র্যান্ড ওকে আশ্রয় দেন, এবং পালিতা কন্যা হিসেবে সঙ্গে রাখেন। কিছুদিনের মধ্যে পালিতা শব্দটা উড়িয়ে দিয়ে কেবল কন্যা শব্দটা ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। আসল ব্যাপার মেয়েকে জানতে দেননি তিনি কোনদিন। প্যারিস কর্তৃপক্ষেরও

জানা সম্ভব ছিল না, কারণ শেষ যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে জার্মানীর প্রায় সমস্ত রেকর্ডই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর ওদিকে ওর যমজ বোন বাপের সঙ্গে এদেশ থেকে ওদেশে পালিয়ে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেয়েছিল পাগল বৈজ্ঞানিক কবির চৌধুরীর কাছে। রাঙামাটির এক পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলেছিল ওদের গোপন গবেষণা, তৈরি হচ্ছিল ক্ষমতা অর্জনের এক ভয়ঙ্কর মহাপরিকল্পনা। রানা ধ্বংস করে দিয়েছিল ওদের সবকিছু, কিন্তু মেয়েটি যে বহাল তবিয়তে বেঁচে বর্তে আছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

'সম্ভব,' রানার বক্তব্য শেষ হতেই ভেসে এল ফিলিপ কার্টারেটের কণ্ঠস্বর। 'আমার মনে হচ্ছে ঠিকই ধরেছ তুমি। সোহানার রিপোর্টের সঙ্গে অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে।' সাইকিয়াট্রিস্টের টেপ থেকে সোহানা যা জানতে পেরেছে সংক্ষেপে রানাকে জানালেন বৃদ্ধ। কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে বললেন, 'বোঝা যাচ্ছে তোমার প্যাট্রিসিয়াই আসল, সোহানারটা ওর যমজ বোন। কিন্তু এতসব কর্মকাণ্ডের পেছনে আসল উদ্দেশ্যটা জানতে পেরেছি আমরা কতখানি? বুঝলাম, লি-বিউসের গবেষণার ব্যাপারে কবির চৌধুরী ইন্টারেস্টেড, আসল প্যাট্রিসিয়াকে সরিয়ে নিজের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আসলে কি চায় ও? একটা কিছু ঘনিয়ে আসছে ঠিকই, কিন্তু কি সেটা? না জানলে কি করে ঠেকাব ওকে?'

'সোহানাকে চব্বিশ ঘণ্টা লেগে থাকতে বলুন নকল প্যাট্রিসিয়ার পেছনে। মেজর সালিভ্যানকে বলুন যেন সব রকম সহযোগিতা দেয় ওকে। বাকিটুকু আমি দেখছি।'

'কি প্ল্যান করছ? কিভাবে খবর সংগ্রহ করবে ভাবছ?'

'সিসিতে গিয়ে।'

'কিভাবে যাবে ওখানে?'

'গোপনে। পানির নিচ দিয়ে। আমি বুঝতে পারছি, সবকিছুর মূল রয়েছে ওই অ্যাকোয়া সিটিতে। টুলন বা মাহমুদ বেগ সিটিতে যা ঘটেছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এসব থেকে কিছুই আঁচ করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। অনেকভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছি আমরা ওদের, ছোটখাট হামলাও চালিয়েছে ওরা, ভেবেছি এবার বুঝি আসল ব্যাপারটার কাছাকাছি যেতে পারব, কিন্তু সম্ভব হয়নি। আমাদের অ্যাপ্রোচের মধ্যেই আসলে ভুল ছিল। ওরা সেই সুযোগটাই নিয়েছে। কবির চৌধুরী ডুব দিয়ে রয়েছে অ্যাকোয়া সিটিতে, দলবলকে বলেছে আমাদের অন্য কোথাও ব্যস্ত রাখতে, যাতে নীরবে নিশ্চিন্তে নিজের কাজ করে যেতে পারে সে। এইবার আসল জায়গায় হানা দিতে হবে আমাকে। দেরি হয়ে গেলে হায় হায় করা ছাড়া আর কোন রাস্তা থাকবে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, মস্ত বিপদ ঘনিয়ে আসছে…আর দেরি করা যায় না।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ফিলিপ কার্টারেট, তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছ, রানা। যদি কিছু ঘটে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার

মধ্যেই ঘটবে সেটা।'

'কি করে জানলেন?'

'টপ সিক্রেট ইনফরমেশন এসেছে আমার কাছে। আগামীকাল সকাল দশটায় টেস্ট ফায়ারিং করা হচ্ছে। ওয়ারহেডটা বাদ দিয়ে পি এইচ ও মিসাইল ছোঁড়া হবে অ্যাকিউরেসি টেস্টের উদ্দেশ্যে। ঠিক তার আগের দিন নকল প্যাট্রিসিয়া ব্যান্ডের কাজে যোগ দেয়া দেখে তাই মনে হয় না তোমার?'

যমজ বোনকে ট্রিসার বদলে রিসার্চ প্রজেক্টে ঢুকিয়ে দেয়া এক কথা, আর দলবল নিয়ে লি-বিউসের সীমানায় ঢুকে যা খুশি তাই করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ—সবদিক থেকে অত্যন্ত কড়া পাহারা দেয়া হচ্ছে এলাকাটাকে। নিজে গিয়ে দেখে এসেছে রানা। পানির নিচে টহল দিচ্ছে দুটো সাবমেরিন, এলাকার চারপাশে ট্যাংক, কামান আর মেশিনগান নিয়ে বসে আছে সদা-প্রস্তুত সেনাবাহিনী। আকাশপথে যে আক্রমণ আসবে তারও উপায় নেই, রাডার-সঙ্কেত পাওয়া মাত্র পঞ্চাশ সেকেন্ডের মধ্যে আকাশে উঠে পড়বে পঞ্চাশটা মিরেজ বিমান। কাজেই কবির চৌধুরী কিভাবে কি ক্ষতি করতে পারে এই রিসার্চ প্রজেক্টের, কিছুতেই মাথায় এল না রানার। তবু ফিলিপ কার্টারেট নকল ট্রিসার কাজে যোগদান এবং টেস্ট ফায়ারিং-এর মধ্যে যে সম্পর্কের যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছেন, সেটা উড়িয়ে দেয়ার মত ব্যাপার নয়। উত্তরে সে শুধু বলল, 'হুম্।'

'নকল প্যাট্রিসিয়া ব্যান্ডকে অ্যারেস্ট করলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

'আমি সেটা ভাল মনে করি না,' বলল রানা। 'যদি নিশ্চিত ভাবে জানা যেত যে ওকে গ্রেফতার করলেই ওদের সমস্ত দুরভিসন্ধি বানচাল হয়ে যাবে, তাহলে এটা করা যেত। ওরা আসলে কি চায় সেটা না জেনে কোন স্টেপ নিতে গেলে সেটা ফল্স্ স্টেপ হয়ে যেতে পারে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তুমি যে ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ, সেটাও আমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না, রানা। তুমি নিজেই বলছ এখনও এক্স এল ফ্লুইড রয়ে গেছে তোমার রক্তের মধ্যে। ডক্টর গরমের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে সেটা খুবই সম্ভব, এই ফ্লুইড সম্পর্কে এখনও সবকিছু জানা যায়নি, সামান্য যেটুকু তোমার শরীরে রয়ে গেছে সেটা কতদিন পর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে তা বলা যায় না। এই অবস্থায়...'

'আর কোন বিকল্প আছে?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা। বৃদ্ধকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'অনর্থক বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া আমার স্বভাব নয়, মিস্টার কার্টারেট। কিন্তু এখন তো আর কোন উপায় আছে বলেও মনে হচ্ছে না। সময় নেই। এই পর্যায়ে রিপ্লেসমেন্ট সম্ভব নয়। কাজেই যাচ্ছি আমি।'

'তোমার কি মনে হয় এ ব্যাপারটা প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার মত বিরাট কিছু?'

'ছোটখাট ব্যাপারে জড়ায় না নিজেকে কবির চৌধুরী।' গলার স্বর পরিবর্তন করল রানা। 'আমি বুঝতে পারছি আপনার অস্বস্তির কারণ। আমার

ব্যাপারে আপনি নিজেকে অনর্থক দায়ী ভাবছেন। ভেবে দেখুন, আপনি ডাকেননি, আমি নিজেই ছুটে গিয়েছি আপনার কাছে সাহায্যের জন্যে। আপনি আমাকে নিয়োগ করেননি, আমি এই অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করছি সরাসরি ঢাকা হেডকোয়ার্টারের হুকুমে। তারা ডেকে পাঠালে আজই হাত গুটিয়ে ফিরে যেতে হবে আমার দেশে—আপনি হাজার অনুরোধ করলেও আপনার হয়ে কোন কাজ করতে পারব না। কাজেই আমার যদি ভালমন্দ কিছু ঘটেও যায়, আপনার অনুশোচনার কিছুই নেই।'

'এত লম্বা বক্তৃতার পরেও মনটা সায় দিচ্ছে না আমার, রানা। যেহেতু জানি, তোমাকে ব্যবহার না করে আমার উপায় নেই, তুমি হাজার বললেও অনুশোচনার হাত থেকে রেহাই নেই আমার। যাই হোক, যেটা করতেই হবে করো, তবে দয়া করে এই বুড়োর মুখ চেয়ে বেশি বিপদের মধ্যে যেয়ো না। তুমি যদি সামান্য কোন ক্লু সংগ্রহ করতে পারো, ফিরে এসে আমাকে জানাও—দরকার হলে আমি প্যারাট্রুপার নামাব সিসিতে। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব জড়িয়ে না পড়তে। থ্যাংকিউ। ওভার অ্যান্ড আউট।'

সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিল রানা শেষবারের মত। ওয়ালথারটার জন্যে মনটা কেমন করছে, কিন্তু ওটা রেখেই যেতে হচ্ছে ওকে—পানির নিচে কাজ হবে না পিস্তল দিয়ে, অনর্থক বোঝা বওয়া। খাপে পোরা স্টিলেটোটা বেঁধে নিয়েছে সে বাম বাহুতে, হাঙর তাড়াবার জন্যে পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে একটা হাতখানেক লম্বা ছোরা, আর একটা পিং পং বলের সমান গ্যাসবম্ব নিয়েছে পকেটে—এই ওর সম্বল।

রাবার স্যুট পরে নিয়ে ফ্লিপার বেঁধে নিল সে পায়ে, তারপর অ্যাকুয়ালাঙ সিলিন্ডার জোড়া পিঠে তুলে বেঁধে ফেলল স্ট্র্যাপ। মাউথপিসটা দাঁতে কামড়ে ধরে ঠিক প্রয়োজন মত অক্সিজেন যেন পাওয়া যায় সেজন্যে অ্যাডজাস্ট করল ভাল্‌ভ্ রিলিজ। তারপর নিঃশব্দে নেমে গেল পানিতে।

প্রায় খাড়া ভাবে নেমে গেছে প্রবাল দ্বীপের ঢাল। যত নিচে নামছে রানা ততই আঁধার হয়ে আসছে চারপাশ। পঁচিশ ফুট নিচে তল পাওয়া গেল। সিসির দিকে মুখ করে সহজ ভঙ্গিতে হাত-পা চালু করে দিল সে। অনেকদূর যেতে হবে, কাজেই তাড়াহুড়ো করবার কোন মানে হয় না। ফ্লিপার বাঁধা পা দুটো সহজ একটা ছন্দ পেয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই, তার সাথে তাল মিলিয়ে দু'হাতে পানি কেটে এগোল সে সমুদ্রের তল ঘেঁষে। বালির ওপর আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে উপরিভাগের ছোট ছোট ঢেউয়ের চলমান ছায়া। ঘাড় বাঁকিয়ে ওপর দিকে চাইল রানা। রুপোলী মুক্তোর মত ঝাঁকে ঝাঁকে বুদ্বুদ উঠে যাচ্ছে। আশা করল, ঢেউগুলোর আড়ালে ঢাকা পড়বে বুদ্বুদগুলো, চোখে পড়বে না কারও।

ঘটনাবিহীন একটা ঘণ্টা পার হয়ে গেল, একটানা সাঁতার কেটে চলেছে রানা। গোটাকয়েক অ্যাঞ্জেল ফিশের ঝাঁক দেখল সে, রঙচঙে বাটারফ্লাই

দেখল, ছোট ছোট অক্টোপাসের বাচ্চাকে সুড়ুৎ করে লুকোতে দেখল পাথরের আড়ালে; দেখল, শুঁড় নাড়ছে অ্যানিমোন—এসবকে কোন ঘটনা বলে মনে হলো না ওর। একবার একটা পর্তুগীজ ম্যান-অভ-ওয়ারের হাত থেকে বেঁচে গেল সে চট করে নিচু হয়ে বসে পড়ায়। হৃৎপিণ্ড বরাবর ধরে ফেললে মারা পড়ত, জানে রানা, তবু এটাকে ঘটনা বলে মনে হলো না ওর কাছে। ওর আসল মনোযোগ রয়েছে দূরের আবছা নড়াচড়ার দিকে। বিশাল, আবছা মূর্তিগুলোকেই যত ভয়।

সিসির কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে ঘুরে দাঁড়াতে হলো ওকে। অতর্কিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন বামদিকে। তারপরই স্থির। ছ'হাত লম্বা একটা ব্যারাকুডা। রানাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে সে-ও। এতই কাছে, যে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা ওটার রাগত বাঘের চোখ, ঝকঝকে তীক্ষ্ণ দাঁত। পায়ের সঙ্গে বাঁধা ছোরাটা চলে এসেছে রানার হাতে। সে-ও রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে কটমট করে চাইল মাছটার দিকে। আক্রমণ করবে, এমন ভাব দেখাল। কয়েক হাত তফাতে সরে গিয়ে রানাকে ভালমত পরীক্ষা করে দেখল বিশাল মাছটা, তারপর লোক সুবিধের নয় টের পেয়ে চলে গেল গভীর সমুদ্রের দিকে। আবার রওনা হলো রানা।

কিন্তু কয়েক মিনিট চলার পরেই আবার থমকে দাঁড়াতে হলো রানাকে। তবে কি দিক ভুল করে অন্য কোথাও চলে এল সে? ঢালু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে মাটি। ওর হিসেব অনুযায়ী পৌঁছে গেছে সে সিসিতে। তাহলে অ্যাকোয়া সিটিটা গেল কোথায়? সিসির দক্ষিণ আর পুব তীর জুড়ে তৈরি হচ্ছে অ্যাকোয়া সিটি, ব্রোশিয়ারে দেখেছে রানা। আশা করেছিল, অন্তত দুশো গজ দূর থেকেই টের পাবে সে, দেখতে পাবে তুমুল উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছে আন্ডার-ওয়াটার যন্ত্রপাতি নিয়ে একশো-দেড়শো ডাইভার। কিন্তু কোথায় কি? শুধু বালি আর পানি। অ্যাকোয়া সিটির কোন চিহ্নই নেই কোথাও। আরও গজ পঁচিশেক এগোতেই পাথুরে মাটি দেখতে পেল রানা, প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে।

লম্বা করে দম নিয়ে সিলিন্ডারের এয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দিল রানা, তারপর উঠতেই শুরু করল ওপর দিকে। কানের পর্দায় তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করতেই চট করে থেমে ডিকম্প্রেশনের জন্যে সময় দিল কয়েক সেকেন্ড। ব্যথা কিছুটা কমে আসতেই ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল আবার। থেমে গেল নাকটা পানির ওপর ভেসে উঠতেই।

গজ বিশেক তফাতে ডাঙা। চারপাশে চোখ বুলিয়ে কাছে-পিঠে চালু কোন বোট দেখতে পেল না সে। ডাঙার ওপর বিশাল প্রাসাদ দেখে বুঝতে পারল, দিক ভুল হয়নি ওর—এটাই মাহমুদ বেগের সিসি। বাড়িটার চারপাশে ঘন সবুজ ঘাস, এখানে ওখানে ফুলের কেয়ারি, মাঝেমধ্যে বিশাল ওক, উইলো, কোথাও বা পাম গাছ। বাম পাশে কয়েকটা জেটি দেখতে পেল রানা সাগরতীরে। একটা জেটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ছোটখাট এক বার্জ, তার

ওপাশে দেখা যাচ্ছে মস্ত বড় একটা ঢেউটিনের ছাত দেয়া সেমি-পাকা গুদামঘর। দুটো হাইড্রোফয়েল বাঁধা রয়েছে একটা ঘাটে। জনা চারেক অ্যাকোয়ালাঙ-পরা লোক ফ্লিপার-বাঁধা পা ঝুলিয়ে বসে আছে কিনারায়। ডান পাশে প্রায় শ'দুয়েক গজ দূরে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ফ্ল্যাট-বোট। পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, ডেকের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাকানো দড়ি, রাবার স্যুট, অ্যাকোয়ালাঙ, আন্ডার-ওয়াটার টর্চ, ফ্লিপার, ছোরা আর সিওটু স্পিয়ার গান। নীল ইউনিফর্ম পরা এক লোক রেলিঙে হেলান দিয়ে চেয়ে রয়েছে খোলা সমুদ্রের দিকে, বাম কাঁধে ঝুলছে একটা সাবমেশিনগান।

এত কাছে চলে আসা ঠিক হয়নি বুঝতে পেরে আবার ডুব দিল রানা। অ্যাকোয়াসিটি গেল কোথায়? কিছু না কিছু নমুনা তো অন্তত থাকবে। কোথায়? ডানদিকে সাঁতার কাটতে শুরু করল সে। পুবদিকটা দেখতে হবে। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে ভেসে উঠল আবার। ডাঙা থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে। ডাঙার ওপর বিনকিউলার গলায় ঝুলানো সশস্ত্র প্রহরী। একটা জেটির ওপর গোটা কয়েক লাল রঙের আন্ডার-ওয়াটার স্লেড দেখতে পেল সে—স্পিয়ার-গান ফিট করা, চলে ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে। কাছেই একটা কমলা রঙের গোলাকার টু-ম্যান সাবমেরিন দেখতে পেল রানা। চিনতে কষ্ট হলো না, কারণ এর ব্লুপ্রিন্ট দেখেছে সে প্রফেসার ব্যান্ডের গোপন কাগজপত্রের মধ্যে। আরও অনেক যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল ওর। ওয়েস্টিং হাউস, ডাইভিং সসার, রেনল্ড অ্যালুমিনট, একজোড়া পেরি সাবমেরিন। ডাঙার ওপর তীর থেকে সামান্য দূরে একটা স্টোরেজ হ্যাঙ্গারে বিরাট সব কাঠের বাক্স সাজানো রয়েছে থরে থরে—খোলা হয়নি এখনও।

নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে আবার ডুব দিয়ে পশ্চিম দিকে চলল রানা। নিশ্চয়ই কাজ চলছে পশ্চিম দিকে, হয়তো ভুল ছাপা হয়েছিল ব্রোশিয়ারে। পশ্চিম দিকেও যখন বালি আর পানি ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না, এর মানেটা কি বোঝার জন্যে ভেসে উঠল সে।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার ডুব দিতে হলো ওকে। একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে একটা হাইড্রোফয়েল প্রায়। অটোমেটিক রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরী সামনে আর পেছনের ডেকে। মাথার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল হাইড্রোফয়েলটা। পানির নিচে সুতো ঝোলানো পুতুলের মত দুলে উঠল রানার শরীরটা। ওটা থামল না দেখে আটকে রাখা দমটা ছাড়ল সে আধমিনিট পর। দেখেনি ওরা ওকে।

অসংখ্য অ্যালুমিনিয়াম আর গ্লাস টিউবিং দিয়ে বোঝাই হয়ে রয়েছে এদিকের ডকটা। এখানেও না-খোলা প্যাকিং বাক্সের ছড়াছড়ি। মোটমাট কম করে হলেও বিশ কোটি টাকার আন্ডার-ওয়াটার ইকুইপমেন্ট রয়েছে এখানে, আন্দাজ করল রানা। অথচ গত দেড়টা বছরে এক পাও এগোয়নি অ্যাকোয়া সিটির কাজ। এর মানে কি? কি চলছে তাহলে এখানে? কি পাহারা দিচ্ছে

এতগুলো সশস্ত্র প্রহরী? ডাঙায় উঠে দেখবে সে আর একটু ভাল করে?

সূর্যের দিকে চেয়ে ফিরে যাওয়াই সিদ্ধান্ত নিল সে। যতটুকু জানা গেছে, প্যারাট্রুপার নামানোর জন্যে ততটুকুই যথেষ্ট। খামোকা ঝুঁকি না নিয়ে ফিরে গিয়ে খবর দেবে সে ফিলিপ কার্টারেটকে। বেলা পড়ে আসছে, কেবিন ক্রুজারে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। খিদে লেগেছে ভয়ানক। ভয় হলো, একা একা জ্ঞান ফিরে পেয়ে কি করছে ট্রিসা কে জানে! এখন ফিরে যাওয়াই ভাল।

এয়ার সাপ্লাইটা চেক করে নিয়ে দিক ঠিক করল রানা চারদিকে নজর বুলিয়ে। তারপর ডুব দিয়ে সাঁতার শুরু করল অস্ট্রেলিয়ান ক্রলের ভঙ্গিতে! ডাইনে-বাঁয়ে আবছা, ধোঁয়াটে দেয়ালে একবার দু'বার গোপন আন্দোলন অনুভব করল রানা, কিন্তু রুখে দাঁড়াবার মত কাছে এল না কেউ। দুই ঘণ্টা বিশ মিনিট লাগল ওর ফিরতে। প্রবাল দ্বীপটা পেয়েই ওপরে উঠতে শুরু করল রানা। পনেরো ফুট উঠে ডিকম্প্রেশনের জন্যে আধ মিনিট স্থির থেকে উঠে এল সে ওপরে।

নেই কেবিন ক্রুজার। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ট্রিসা সহ।

ভারী কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেল রানার কাঁধ। হাত বাড়িয়ে ধরল সে জিনিসটা। বড়সড় একটা কাঠের টুকরো। ধরেই বুঝতে পারল রানা, আর কিছু নয়, এটা মোবাইল গার্লেরই একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।

চুরমার করে দেয়া হয়েছে মোবাইল গার্লকে।

এগারো

সিসিতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই বুঝতে পারল রানা।

সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় লাগল না ওর। কাল সকাল দশটায় টেস্টফায়ারিং। সময় নেই হাতে। কাউকে কিছু জানাবার উপায় নেই এখন। যা করবার রানাকেই করতে হবে। প্রথমে সিসিতে গিয়ে সবকিছু দেখেশুনে বুঝতে হবে কবির চৌধুরীর সত্যিকার উদ্দেশ্য, তারপর চেষ্টা করতে হবে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়ার। অন্ধকার হাতড়ে কোন লাভ নেই—গিয়ে নিজের চোখে দেখতে হবে সব।

মিটার চেক করে দেখল রানা। সিলিন্ডারে যেটুকু অক্সিজেন আছে, বড়জোর মাইলখানেক পথ চলা যাবে। অর্থাৎ, তিনটে মাইল ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝে এগোতে হবে ওকে, তার পরের এক মাইল চলবে পানির নিচ দিয়ে।

দোয়াতের কালির মত কুচকুচে কালো পানি। ঘোলাটে একটা চাঁদ উঠেছে ঠিকই, কিন্তু এতই নিচে রয়েছে যে দিক নির্ণয় ছাড়া আর কোন সাহায্য ওটার কাছ থেকে আশা করা বৃথা। দেরি না করে রওনা হয়ে গেল

রানা। ফ্রী-স্টাইলে সাঁতার কাটছে সে এবার। মুখটা একবার চলে যাচ্ছে পানির নিচে, আবার ডানহাতটা ফেলার সময় ওপরে উঠে 'হাপ' করে দম নিচ্ছে।

মেয়েটাকে কি মেরে ফেলল ওরা? নাকি ধরে নিয়ে গেল সিসিতে। যাবার সময় বোমা ফিট করেনি রানা মোবাইল গার্লে। যতদূর মনে হচ্ছে কোন রকম সুযোগ দেয়নি ওরা এবার, দেখামাত্র হাইড্রোফয়েল থেকে রিকয়েললেস রাইফেল দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে মোবাইল গার্ল। সেক্ষেত্রে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা ট্রিসার খুবই কম। অবশ্য যদি ট্রিসাই ওদের রেডিও সিগন্যাল দিয়ে মোবাইল গার্লের অবস্থান জানিয়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা।

দ্বিগুণেরও বেশি সময় লাগবে এবার সিসি পৌঁছতে, বুঝতে পারল রানা। বাতাস উঠেছে সাগরে। এক মানুষ সমান ঢেউ হাজার শিং তুলে নাচছে সাগরময়। এই ঢেউয়ের মন-মেজাজ লক্ষ করে এগোতে হচ্ছে ওকে, নইলে পানি খেয়ে ঢোল হয়ে যাবে পেট। পথ আর ফুরোবে বলে মনে হচ্ছে না। দু'ঘণ্টা একটানা সাঁতার কেটেও সিসির কোন নাম নিশানা দেখতে পাচ্ছে না সে। বাকি আছে বহুদূর। হঠাৎ হঠাৎ আতঙ্ক এসে ভর করতে চাইছে ওর মনে। মনে হচ্ছে হারিয়ে গেছে সে, কোনদিন তীরে পৌঁছতে পারবে না আর, এমনি সাঁতার কাটতে কাটতে অবসন্ন হয়ে ডুবে যেতে হবে ওকে সাগরের অন্ধকারে। ছলাৎ—শব্দ করে ফ্লাইংফিশকে পানির ওপর লাফিয়ে উঠতে দেখে মনে হচ্ছে হাঙর বুঝি।

ভয় কিভাবে দূর করতে হয় সে ব্যাপারে ট্রেনিং পেয়েছে সে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে—কিন্তু অবসাদ? সারা দিনের না খাওয়া শরীর আর চলতে চাইছে না কিছুতেই। ক্লান্তিতে ঘুম এসে যেতে চাইছে। তবু অবসন্ন হাত টেনে চলল সে পানির মধ্যে দিয়ে—একবার বাম, একবার ডান, একবার বাম, একবার ডান। এখন হাল ছেড়ে দিলেই মৃত্যু।

চকচকে তারাগুলোকে খানিকটা নিষ্প্রভ করে দিয়ে বেশ অনেকটা ওপরে উঠে পড়েছে চাঁদ। এক ফুট দুই ফুট করে ঝাড়া সাড়ে তিন ঘণ্টা সামনে এগিয়ে সিসির বাতি দেখতে পেল রানা। ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে বাতিগুলো। বিশাল জাহাজের মত আবছা দেখা যাচ্ছে মাহমুদ বেগের প্রাসাদ। মাঝে মাঝে দপ্ করে জ্বলে উঠছে সার্চলাইট। যতদূর দেখা যায় দেখে নিয়ে নিভে যাচ্ছে।

মাইলখানেক থাকতে মাউথপিস্টা দাঁতে কামড়ে ধরে এয়ার সাপ্লাইয়ের চাবি খুলে দিয়ে ডুব দিল রানা। ঢেউয়ের অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। আশ্চর্য আরাম লাগল ওর কাছে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে তলিয়ে যেতে। কয়েক ফুট নামতেই ঘনিয়ে এল গাঢ় অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না, এমন কি নিজের হাতও না। পায়ে মাটি ঠেকতেই ধীর ছন্দে সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল সে সিসির পাথুরে ঢালের কাছে। এবার আর সোজা ওপর দিকে না উঠে ঢাল বেয়ে উঠে

আসতে শুরু করল সে। পা দুটো চলছে সমান তালেই, কিন্তু হাত দুটো এখন আর সাঁতার কাটছে না—পাথরের গা ছুঁয়ে উঠে আসছে সে ওপর থেকে।

এয়ার সাপ্লাই প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে এসেছে বুঝতে পারছে রানা। কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে। ভাগ্যিস মাঝ পথে শেষ হয়নি। তাহলে মহা বিপদ হত। শরীরের ওপর পানির চাপ অনেক কমে এসেছে দেখে বুঝতে পারছে সে, আর বড় জোর দশ ফুট ওপরেই রয়েছে মুক্ত বাতাস। শেষবারের মত বুক ভরে দম নিয়ে শ্বাস আটকে রাখল রানা। ডাঙার এত কাছে এসে ভুড়ভুড়ি ছাড়া ঠিক হচ্ছে না। রিলিজ ক্যাচ খুলে দিতেই পিঠের ওপর থেকে সিলিন্ডারটা আলগা হয়ে নেমে গেল সাগর-গভীরে।

শেষটুকু প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে ওপর দিকে। এবড়োখেবড়ো পাথরগুলো কোনটা মসৃণ, আবার কোনটা চোখা। হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে ধরে উঠে আসছে রানা নিশ্চিন্তে—হঠাৎ মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল: সাবধান! কিন্তু সাবধান হওয়ার আগেই ডানহাতটা গিয়ে পড়ল ওর একটা তারের ওপর। টান লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ছিঁড়ে গেল সরু তারটা, প্রচণ্ড একটা শক খেল সে, নাক দিয়ে বেরিয়ে গেল খানিকটা বাতাস, তারের মাথায় দেখতে পেল ছোট্ট ফুলকির মত ইলেকট্রিক স্পার্ক।

রানা কিছুটা সামলে নেয়ার আগেই মাথার ওপর কোথাও দপ করে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল ফ্লাডলাইট। পরমুহূর্তে ঝুপ করে কি যেন পড়ল পানিতে—কয়েক গজ ডাইনে। ওপরে চেয়েই চমকে উঠল রানা। কালো রাবার স্যুট পরা একজন লোক ডাইভ দিয়ে পড়েছে পানিতে। হাতে একটা বর্শা লাগানো সিওটু গান, আরও কয়েকটা বর্শা বাঁধা রয়েছে লোকটার পায়ের সঙ্গে। পায়ে ফ্লিপার তো রয়েছেই, আরও দ্রুত চলার জন্যে লোকটার পিঠের ওপর রয়েছে একটা কম্প্রেস্‌ড্ এয়ার স্পীড প্যাক। তীরবেগে ছুটে আসছে লোকটা ওর দিকে।

লোকটা প্রস্তুত হওয়ার আগেই ওর কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করল রানা, লাফ দিল ওপর দিকে, প্রাণপণে নাড়ল পায়ে বাঁধা ফ্লিপার দুটো। কিন্তু না, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা, সিওটু গান তাক করছে ওর দিকে। অন্তত সাত ফুট দূরে রয়েছে লোকটা। রানা বুঝল পৌঁছবার আগেই টিপে দেবে সে ট্রিগার। কাজেই চট করে ডিগবাজি খেয়ে গোল হয়ে গেল সে। টার্গেট যত ছোট করে আনা যায় ততই মঙ্গল। এরপরেও যদি বর্শা এসে হৃৎপিণ্ড বরাবর বেঁধে, বিঁধবে—করবার কিছুই নেই ওর। গ্যাস এক্সপ্লোশনের ধাক্কা অনুভব করল সে কোমরের কাছে, পরমুহূর্তে ঠিক যেন একটা ছড়ির আঘাত পড়ল ওর পিঠে। মিস্ হয়েছে! চকচকে বর্শাটা দেখতে পেল রানা। ঝিক করে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের দিকে। ব্যারেলের মধ্যে আর একটা বর্শা ভরছে লোকটা ব্যস্ত হাতে।

প্রাণপণে চার হাত-পা চালিয়ে ওপরে উঠে এল রানা। দম আটকে রাখায় শর্ষেফুল দেখতে শুরু করেছে সে চোখে। লোকটা সরে যাওয়ার চেষ্টা করল,

কিন্তু উঠে এসেছে রানা ততক্ষণে। স্টিলেটোটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। হাত চালাল রানা। পানির নিচে নড়তে চাইছে না হাত। স্লোমোশন ছায়াছবির মত ধীরগতিতে ছুরিটা এসে ঠেকল লোকটার পেটের কাছে রাবার স্যুটের গায়ে, সামান্য একটু বাঁকা করে ওপর দিকে চাপ দিতেই বিনা বাধায় আলগোছে ভিতরে ঢুকে গেল পুরোটা ফলা। যন্ত্রণায় বাঁকা হয়ে গেল লোকটা, মাছের মত এঁকেবেঁকে মোচড়াচ্ছে। ছুরি যেখানটায় বিঁধেছে সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করেছে। নিচের দিকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে চড়চড় করে ইঞ্চি চারেক রাবার ফেড়ে দিয়ে একটানে বের করে আনল রানা স্টিলেটোটা। এবার কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে চারপাশ। খানিকটা সরে এল রানা, দেখল ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে লোকটার পেট থেকে রক্ত; ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে শরীরটা নিচের দিকে।

আরও কেউ আছে? চারপাশে নজর বুলাল রানা। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। টলতে টলতে পাথুরে পাড় বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে। শরীর আর চলতে চাইছে না। বাতাস, বাতাস চাই! বুকটা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। নিজের অজান্তেই ঢক্ করে একঢোক নোনা পানি খেয়ে ফেলল সে। খেয়েই সচকিত হয়ে একত্রিত করল সমস্ত মনোবল—তীরে এসে তরী ডোবালে চলবে না। আর মাত্র কয়েক ফুট, উঠতেই হবে ওকে ওপরে। শেষমুহূর্তে আর সহ্য করতে না পেরে পাথরের গায়ে পা বাধিয়ে সোজা ওপর দিকে লাফ দিল সে।

জোর ধাক্কা খেল রানা কাঁধে, রাবার থাকায় ততটা লাগল না। চট করে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল সে কাঠের থামটা। একটা জেটির নিচে ভেসে উঠেছে সে। থামটা আঁকড়ে ধরে বুক ভরে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিল সে দু'মিনিট, তারপর ঘাটের কাছে সরে এল। শুধু নাকটা ভাসিয়ে রেখে ঢালু পাড়ের গায়ে শুয়ে আরও তিন মিনিট বিশ্রাম করে নিয়ে পায়ের ফ্লিপার আর অ্যাকুয়ালাঙ খুলে ফেলল। চারপাশে চেয়ে আর কোন লোক দেখতে পেল না রানা, কিন্তু আবছাভাবে একটা ঝিঁঝির মত ডাক কানে এল ওর। নিশ্চয়ই অ্যালার্ম বেল। ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে গেল সে জেটির একপাশে ছোট্ট একটা ঘরের দিকে।

একাই ছিল প্রহরীটা, নিশ্চিন্তে সিগারেট টানছিল, অ্যালার্ম বাযার বেজে উঠতেই আধ-খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রেখে গিয়েছিল অনুসন্ধান করতে। এখনও ধোঁয়া উঠছে ওটা থেকে। দেয়ালের গায়ে অ্যালার্মবোর্ড। কোন্‌টা বাজছে বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার, কিন্তু কিভাবে ওটার আওয়াজ থামাবে বুঝে উঠতে পারল না। ঠিক কোন্‌খানে তার ছিঁড়েছে বোঝার সুবিধের জন্যে প্রতি দশগজ পর পর আলাদা বেল বাজবার ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে ঠিক জায়গামত পৌঁছতে সময় না লাগে। এখানে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই, কাজেই প্লাগটা টেনে বের করে নিল রানা সকেট থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল বাজনা। আর একটা সুইচ টিপতেই অফ হয়ে গেল

ফ্লাড লাইট।

নিঃশব্দ পায়ে বিরাট বাড়িটার দিকে এগোল রানা এগাছের আড়াল থেকে ওগাছের আড়ালে লুকিয়ে। বেশ কয়েকজন সশস্ত্র গার্ড দেখতে পেল সে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত, কেউ টহল দিচ্ছে দৃঢ় পদক্ষেপে। সবার চোখ বাঁচিয়ে সামনে এগোনো সহজ কথা নয়। কখনও হেঁটে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, আবার কখনও সটান ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে এগোতে হচ্ছে ওকে। থামতে হচ্ছে বার বার। এইভাবে আধঘণ্টা লেগে গেল ওর প্রাসাদের পেছন দিকে পৌঁছতে। জানালা দরজা সব বন্ধ। একের পর এক পাঁচটা জানালার পেছনে পনেরো মিনিট ব্যয় করবার পর ষষ্ঠ জানালার ফাঁকে স্টীলের ব্লেডটা ঢোকাতেই খুট করে খুলে গেল ক্যাচ। কান পাতল রানা। কোথাও কোন অ্যালার্ম বেল বাজছে না সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে আস্তে করে খুলে ফেলল সে একটা কপাট। গিলটি মিঞার মত নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ডাইনিং হল। খাওয়া দাওয়া শেষ, ফাঁকা টেবিল চেয়ার পড়ে আছে কেবল। পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিল পাকস্থলীটা। চট করে রান্নাঘরের দিকে চোখ গেল রানার। সুযোগ পেলে খুঁজেপেতে চারটে খেয়ে নিতে হবে, স্থির করল সে। কিন্তু তার আগে পুরোটা বাড়ি ঘুরে অবস্থা বুঝে নিতে হবে।

আশ্চর্য! কোথাও কেউ নেই। একেবারে শূন্য এত বড় বাড়িটার গোটা একতলা।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল রানা। দোতলাও খালি। সব ঘর দেখে তেতলায় ওঠার সিঁড়িতে পা দিয়ে হঠাৎ একটা বন্ধ দরজার দিকে চোখ পড়তেই থেমে দাঁড়াল সে। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলেই চমকে উঠল। একটা চেয়ারে দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে এক বৃদ্ধ। হাত-পা বাঁধা রয়েছে চেয়ারের সঙ্গে। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। একনজরেই চিনতে পারল রানা, মাহমুদ বেগ। মরে গেল নাকি! তিন পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল মাহমুদ বেগকে চমকে সোজা হয়ে চাইতে দেখে।

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মাহমুদ বেগের লালচে মুখটা। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইল রানার হাতে ধরা স্টিলেটোর দিকে, তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

'তোমার পায়ে পড়ি! এইভাবে না! প্লীজ!...গুলি করে মেরে ফেলো!' রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে চোখ বুজে শিউরে উঠল লোকটা। ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে হাত-পায়ের বাঁধন কাটা হচ্ছে টের পেয়ে আবার চোখ মেলল মাহমুদ বেগ। 'কে...কে তুমি!'

'আর সবাই কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা নিচু গলায়। 'কাউকে দেখছি না কেন?'

'ওরা...ওরা সব কাজে নেমে গেছে...তুমি কে?'

'মরতে বসেও মিথ্যে কথা!' ধমকে উঠল রানা। 'নিজের চোখে দেখে

এসেছি আমি। অ্যাকোয়াসিটির এক ধাপ কাজও হয়নি কোথাও। কোথায় গেছে সব? আপনাকেই বা বন্দী করে রাখা হয়েছে কেন? কবির চৌধুরীর সঙ্গে খাতির শেষ?'

আপাদমস্তক দেখল লোকটা রানাকে। বুঝতে পারল এই লোক এইমাত্র বাইরে থেকে এসেছে, এখানে কি চলছে কিছুই জানে না। রাবার স্যুট দেখে আঁচ করে নিল প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সমুদ্রের নিচ দিয়ে এসেছে এ এখানে।

'আপনি গভমেন্টের লোক?' রানাকে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতে দেখে বলল, 'তাহলে এক্ষুণি ট্রুপস ডাকার ব্যবস্থা করুন। অ্যাকোয়াসিটি হচ্ছে না এখানে।'

'কি হচ্ছে?'

'জানি না। মাটির নিচে কাজ চলছে। আমাকে ঢুকতে দেয়া হয় না। গত একটা বছর বন্দী জীবন যাপন করছি আমি এখানে। এতদিন হাত-পা বাঁধেনি, আশা দিয়ে রেখেছিল ওদের কাজ ফুরোলেই ছেড়ে দেয়া হবে; কিন্তু আজ আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ওদের কাছে, আজই আমার জীবনের শেষ রাত।'

'বাইরে খবর পাঠাবার কোন ব্যবস্থা আছে এখানে?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'থাকলে এতদিন চুপচাপ বসে থাকতাম না। আপনার কাছে নিশ্চয়ই মিনি-অয়্যারলেস বা ওই জাতীয় কিছু আছে...ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে, এই মুহূর্তে আপনার খবর দেয়া উচিত—'

'আমার কাছে কিছুই নেই ওসব। আপনাদের এখানে একটা টেলিফোনও নেই বলতে চান?'

'নেই। থাকলে আমি গত একটা বছরে অন্তত একবার সুযোগ পেতাম বাইরে খবর পাঠাবার। কোন সুযোগ পাইনি। এ বাড়ি থেকে এক পা বাইরে বেরোবার উপায় নেই আমার।'

'মাটির নিচে কাজ চলছে বলছেন...ওরা আসা যাওয়া করে কোন্‌দিক দিয়ে? নিশ্চয়ই পথ আছে কোথাও?'

'আছে। কিন্তু আপনি একা কি করবেন? ওরা অনেক লোক। নিচে নামলেই ধরা পড়ে যাবেন।'

'কি ধরনের কাজ চলছে নিচে? কোন ধারণাই নেই আপনার?'

'কিচ্ছু না। চব্বিশ ঘন্টা কাজ চলেছে মাটির নিচে শুধু এইটুকু বলতে পারি। একদল যায়, একদল ফিরে আসে। এই কিছুক্ষণ হলো নিচে গেছে ডি-গ্রুপ, ফিরে আসবার সময় হয়েছে এ-গ্রুপের। আপনি নিচে নামলে—'

'তবু আমাকে নামতে হবে। জানতে হবে কি চলছে নিচে। সম্ভব হলে ঠেকাতে হবে। ইতিমধ্যে আপনার নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা? লুকোবার কোন জায়গা আছে?'

'আছে। কিন্তু কতক্ষণ? দিনের পর দিন তো আর লুকিয়ে থাকা যায় না।

এমন একটা জায়গা আছে যেখানে লুকোলে কারও সাধ্য নেই আমাকে খুঁজে বের করে, কিন্তু না খেয়ে—'

'সেইখানেই লুকিয়ে পড়ুন,' হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল রানা মাহমুদ বেগকে। 'আগে আমাকে নিচে নামার পথটা দেখিয়ে দিন। কাল সকাল দশটার মধ্যে যদি আমি উঠে না আসি, প্যারাট্রুপার নামবে এই অঞ্চলে, তখন আপনি নিশ্চিন্তে বেরিয়ে আসতে পারবেন লুকোনো জায়গা থেকে। কিন্তু সবচেয়ে আগে আমার কিছু খাওয়া দরকার···রান্না ঘরে পাওয়া যাবে না কিছু?'

'আসুন আমার সঙ্গে।' রানাকে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মাহমুদ বেগ একতলায়। একটা প্লেটের ওপর ফ্রিজ থেকে কিছু ঠাণ্ডা খাবার তুলে দিয়ে বলল, 'চলুন, আপনাকে নিচে নামার জায়গাটা দেখিয়ে দিই। এখন একটু তাড়াতাড়ি না করলে এসে পড়বে এ-গ্রুপ।'

খেতে খেতে এগোল রানা। হলরুমের একটা দেয়ালের গায়ে বসানো ওয়াইন-ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মাহমুদ বেগ। 'এই দেয়ালটা ছিল না আগে। ওরাই বানিয়েছে! আরও ছ'ফুট লম্বা ছিল হলটা, কিন্তু বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। আর এই যে ওয়াইন-ক্যাবিনেটের কড়া দেখছেন—' ডান দিকের কড়াটা বাঁয়ে তিন প্যাঁচ, আর বাম দিকের কড়াটা ডাইনে তিন প্যাঁচ দিয়ে আস্তে টান দিতেই ফাঁক হতে শুরু করল দরজা। 'এইভাবে খুলতে হয়। ওপাশে লোহার সিঁড়ি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বন্ধ করে দিল রানা ডালা দুটো। 'এবার আপনি লুকিয়ে পড়ুন। এ-গ্রুপ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমিও, তারপর নামব নিচে। ওরা বেরিয়ে প্রথমে কোন্‌দিকে যাবে?'

'সোজা ডাইনিংরুম হয়ে চলে যাবে নিজেদের কোয়ার্টারে। তেতলাটা ব্যারাক বানানো হয়েছে ওদের।'

রানার খাওয়া প্রায় শেষ। উচ্ছিষ্টটুকু গারবেজ-বাস্কেটে ফেলে যথাস্থানে রেখে দিল প্লেটটা। মাহমুদ বেগকে ডাইনিং রুমের কোণে দাঁড় করানো একটা কাঠের মূর্তির দিকে এগোতে দেখে মৃদু হাসল সে। মূর্তির আড়ালে লুকোতে চায় ব্যাটা। হলরুমের দিক থেকে খটাং করে একটা আওয়াজ আসতেই একছুটে চলে গেল মাহমুদ বেগ মূর্তিটার কাছে। রান্নাঘরের চারপাশে চেয়ে লুকোবার জায়গা খুঁজল রানা। বিশাল ফ্রিজিডিয়ারের ওপাশটা মনে মনে পছন্দ করে আবার মূর্তির দিকে চেয়েই চমকে উঠল সে। মাহমুদ বেগকে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তার ড্রেসিং-গাউনের একাংশ বেরিয়ে রয়েছে বাইরে। ওদিকে কারও চোখ পড়লে আর রক্ষা নেই! এখন আর সাবধান করবারও রাস্তা নেই। ডাইনিং রুমের দরজার কাছে চলে এসেছে পায়ের শব্দ—সেই সঙ্গে কথাবার্তার আওয়াজ। ওরা সংখ্যায় ক'জন জানবার কৌতূহল দমন করে সরে এল রানা ফ্রিজের আড়ালে।

তিনমিনিট পর প্রায় মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ আর কথাবার্তার আওয়াজ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে ওরা তেতলায়। দরজার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে ড্রেসিং গাউনের অংশটা দেখতে পেয়ে হাঁপ ছাড়ল রানা—যাক, চোখে পড়েনি কারও। চারপাশে চোখ বুলিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে কাঠের মূর্তির কাছে চলে এল সে, কাপড়ের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে এগোল হলরুমের দিকে।

তিনধাপ লোহার মই বেয়ে ওয়াইন-ক্যাবিনেটের দরজা লাগিয়ে দিল রানা। বারোফুট নামতেই পাওয়া গেল একটা উজ্জ্বল-আলোকিত আটফুট চওড়া প্যাসেজ। প্যাসেজ ধরে ঠিক বিশ কদম যেতে না যেতেই পেছন থেকে গর্জে উঠল কে যেন: 'হল্ট!'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ডান হাতে চলে এসেছে স্টিলেটো প্রস্তুত।

চোখের সামনে যা দেখল তাতে পিন ফোটানো বেলুনের মত চুপসে গেল রানা। স্টিলেটোটা ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে মাথার ওপর তুলল দুই হাত

বারো

যদি দু'জন হত, এমন কি যদি চারজনও হত, শেষ চেষ্টা করে দেখত রানা। কিন্তু দুই সারিতে বারো দুগুণে চব্বিশজন মাস্ক পরা লোককে কাবু করা ওর সাধ্যের অতীত। সামনের লোকটাকে নিয়ে পঁচিশজন। একটা সাবমেশিনগান রানার বুকের দিকে তাক করে ধরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা।

এতগুলো লোক হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হলো? চট করে চোখ গেল রানার দেয়ালের গায়ে আধখোলা একটা ভেন্টিলেশন টানেলের দিকে। প্যাসেজের দেয়ালগুলোর মতই পালিশ করা জিংকশীটের তৈরি ওটা—ওই ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে এসেছে লোকগুলো।

'হাত দুটো উঁচু রেখে ধীর পায়ে এগোও আমার দিকে,' হুকুম করল সাবমেশিনগানধারী।

ধীর পায়ে এগোল রানা। অস্পষ্ট একটা টুংটাং আওয়াজ এল ওর কানে। চট করে চোখ তুলে পেছনে দাঁড়ানো দলটার দিকে চাইল সে। নিমেষে কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। লীডারের সঙ্গে পেছনের লোকগুলোর তফাৎ এতক্ষণ চোখেই পড়েনি ওর। প্রথমত, একমাত্র লীডারের কাছেই অস্ত্র রয়েছে, আর কারও কাছেই নেই। দ্বিতীয়ত, দুই সারির চব্বিশজন লোকের প্রত্যেকেরই হাত দুটো রয়েছে পেছন দিকে। তৃতীয়ত, পরনে রাবার স্যুট রয়েছে প্রত্যেকেরই, মাস্ক আঁটা রয়েছে মুখে, কিন্তু ওদের স্যুটগুলো কমলা রঙের, লীডারেরটা কালো। লীডারের কোমরের বেল্টের সাথে ঝুলছে একটা আন্ডার ওয়াটার টর্চ, একটা দেড়ফুট লম্বা হান্টার, আর একগোছা চাবি।

প্রতিটা পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে রানার কাছে অনেক কিছু, একেবারে স্পষ্ট করে বোঝার জন্যে যে সময় দরকার চিন্তা করবার—সে সময় হাতে নেই, কিন্তু মোটামুটি সুনিশ্চিত হয়ে গেল রানা, ওর সামনে পঁচিশজন শত্রু দাঁড়িয়ে নেই। শত্রু আসলে একজনই, বাকি চব্বিশজন বন্ধু যদি নাও হয়, নিরপেক্ষ থাকবে অন্তত।

কাছাকাছি এসে ইচ্ছে করেই একটা হোঁচট খেল রানা। সামলে নেয়ার ভঙ্গি করল, পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ বেগে নেমে এল ওর ডান হাত লোকটার কাঁধের কোমল নার্ভসেন্টারের ওপর। খটাং করে পড়ল সাবমেশিনগানটা মেঝের ওপর। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। গলা পর্যন্ত ঢাকা হেলমেটের ভিতর খোট মাইক থাকায় বিকট শোনাল চিৎকারটা। বিন্দুমাত্র দেরি না করে দড়াম করে লাথি চালাল রানা লোকটার তলপেট লক্ষ্য করে। মাস্কের কাঁচের ওপাশে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা দাঁতে দাঁত চেপে বিকৃত করে ফেলেছে লোকটা চোখমুখ, শরীরটা বাঁকা হয়ে গেল ওর, মাথাটা ঝুঁকে এল সামনের দিকে। দ্বিধার সময় নেই। ধাঁই করে মারল রানা লোকটার খুলির ঠিক নিচেই ঘাড়ের পেছনে। কড়াৎ করে শব্দ হলো একটা, ঝপ্ করে পড়ে গেল সে মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে।

চট করে সাবমেশিনগানটা হাতে তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল রানা বাকি চব্বিশ জনের বিরুদ্ধে, আক্রমণের ভাব দেখলেই গুলি করবে। কয়েক সেকেন্ড কেউ নড়ল না, তারপর সামনের একজন পাশ ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে ওর পেছনটা লক্ষ করতে বলল রানাকে। হ্যান্ডকাফ। রানা দেখল, হ্যান্ডকাফ পরানো আছে লোকটার হাতে, শক্ত শিকল দিয়ে একজনের হ্যান্ডকাফের সঙ্গে আরেকজনেরটা জোড়া। অস্ত্রধারী গার্ডের কোমর থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে চট করে হ্যান্ডকাফ খুলে দিল রানা লোকটার। পাশেরজনেরটাও খুলতে যাচ্ছিল, মাথা নেড়ে নিষেধ করল সে। কব্জিদুটো একটু ম্যাসাজ করে নিয়ে মাথার ওপর থেকে অক্সিজেন রিব্রিদার খুলে ফেলল প্রথম জন। বেশ বয়স্ক, স্বাস্থ্যবান। বোঝা যায় ফ্রেঞ্চ।

রানা কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, চট করে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল লোকটা, তারপর অপর হাতের তর্জনী দিয়ে দেখাল ভেন্টিলেটার-শ্যাফটের দিকে। রানাকে নিয়ে শ্যাফটের ভিতরে গিয়ে ওর কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'আমার নাম রয় সান্তানা···ফ্রেঞ্চ ডাইভার। নষ্ট করবার সময় নেই। সবখানে টিভি-মনিটর রয়েছে। সামনেই রয়েছে একটা, আর এক মিনিটের মধ্যে ওর সামনে দিয়ে যদি আমরা না যাই, সার্চ পার্টি পাঠানো হবে আমাদের খুঁজে বের করার জন্যে।' এদিক ওদিক চাইল লোকটা, মনে হলো গোপন মাইক্রোফোন রয়েছে কিনা দেখছে, তারপর বলল, 'এই লোকটার রাবার স্যুটটা পরে নিন, তারপর আমাদের আগে আগে চলবেন। কোনদিকে যেতে হবে, কি করতে হবে সব বলে দেব আমি। প্রত্যেকটা ওয়ার্ক-পার্টির লীডারের সঙ্গে দলের অন্য সবার যোগাযোগ রয়েছে বেনডিক্স্ম্যারিন রেডিও

সিসটেমের মাধ্যমে, বাইরের কেউ শুনতে পাবে না আমরা আলাপ করলে। ব্যাটারিতে চলে। থ্রোট মাইক ব্যবহার করবেন। কামন। কুইক।'

ভেন্টিলেশন শ্যাফটের মধ্যে গার্ডের লাশটা নিয়ে এল দু'জন ধরাধরি করে। হেলমেটটা খুলেই অবাক হয়ে গেল রানা—আমাদের উপমহাদেশের লোক। কোন্ দেশী বোঝা গেল না। পোশাক বদলে নিতে আধ মিনিটের বেশি লাগল না। বেল্টের ওপর দুটো বোতাম দেখিয়ে রয় সান্তানা বলল, 'এই দুটো বোতাম টিপবেন না। সাদাটা টিপলে রিব্রিদারের বাইরে অ্যামপ্লিফায়েড হয়ে শোনা যাবে আপনার গলা, আর এই লালটা টিপলে মেইন কমিউনিকেশন সার্কিটের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে আপনার। সিগন্যাল না দিলে কিছুতেই স্পর্শ করবেন না ওই লালটা।'

এক মিনিটের মধ্যেই রওনা হয়ে গেল ওরা। স্টিলেটোটা মাটি থেকে তুলে খাপে পুরে নিতে ভুলল না রানা। গার্ডের দেহটা শ্যাফটের একটা এয়ার টানেলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে ওরা দু'জন মিলে। চট করে চোখে পড়বে না কারও। দুই সারিতে চলেছে বারো দুগুণে চব্বিশ জন, রানা চলেছে আগে আগে সাব মেশিনগান হাতে।

'এখানেই মনিটর।' রয় সান্তানার ধাতব কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। 'দেখতে পাবেন না। লুকোনো। ডান হাতটা ওপরে তুলুন। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করুন। হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এর মানে আপনি ও. কে. সাইন দিলেন, সব ঠিক আছে। এইবার ডানদিকের শ্যাফটে ঢুকে পড়ুন।'

গোল টানেল। পালিশ করা জিংকের তৈরি। রানা টের পেল ধীরে ধীরে নামছে ওরা নিচের দিকে। চলতে চলতে যতদূর সম্ভব দ্রুত তথ্য দিয়ে চলল সান্তানা। জানা গেল, ওরা কিছুক্ষণ হয় ঢুকেছে টানেলে, কাছে যাচ্ছে, ভেন্টিলেশন সিসটেমের একটা ছোট্ট দোষ রিপেয়ার করবার জন্যে থেমেছিল। এয়ার সাপ্লাই কেটে দিতে হয়েছিল বলে সবাইকে রিব্রিদার করতে হয়েছিল, ভ্যাকিয়ুম টিউবের দিকে চলেছে বলে এগুলো আর খোলার দরকার নেই এখন।

'একটা প্রশ্ন,' বলল রানা। 'আপনাদেরকে অ্যাকুয়াসিটি তৈরির জন্যে কন্ট্র্যাক্ট করা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কি তৈরি করছি জানি না, শুধু জানি—এটা অ্যাকুয়াসিটি নয়। আপনি সরকারী লোক নিশ্চয়ই?'

'এক অর্থে বলতে পারেন। যদিও আমি ফ্রেঞ্চ নই, আপনাদের সরকারের অনুমতিক্রমেই এসেছি আমি এখানে কি ঘটছে জানতে।'

'কি ঘটছে জানি, কারণ আমরাই ঘটাচ্ছি,' বলল সান্তানা। 'কিন্তু কেন কি করছি কিচ্ছু জানি না। এক বছরের ওপর হয়ে গেল, আমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। ছিলাম দেড়শো জন, এখন আছি একশো বিশ জন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে আমাদের চোখের সামনে মেরে ফেলা হয়েছে বাকি ত্রিশজনকে। হুকুম ছাড়া পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। এই যে,

আরেকটা মনিটর আসছে। আগের বার যা করেছেন, ঠিক তাই করুন আবার, তারপরই বাঁয়ে ঘুরতে হবে সামনের চৌমাথায়।'

যা যা বলা হচ্ছে সেইমত করতে করতে এগিয়ে চলল রানা। ক্রমে বাতাসটা গরম হয়ে উঠেছে। সান্তানার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে সে, শত্রুপক্ষে প্রায় চল্লিশজন লোক রয়েছে, ডাইভারদের তিনভাগের এক ভাগ; কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যাপারে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ওদের এমনই বাঁধা বেঁধে নিয়েছে কবির চৌধুরী যে ওর অজান্তে নিশ্চিন্তে একটা হাঁচি পর্যন্ত দেয়ার উপায় নেই।

'আমরা মেইন কন্ট্রোলরুমের কাছে চলে এসেছি,' বলল সান্তানা। 'ঘাবড়াবার কিছুই নেই। যা বলব করে যাবেন, তাহলে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। একটা জায়গা জানা আছে আমার যেখানে বসে মন খুলে আলাপ করা যেতে পারে। কিন্তু শিফট শেষ করে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আমি,' বলল রানা। 'আপনাদের কারও আত্মীয়স্বজন নেই, বন্দী করে রেখে দিল ওরা এতগুলো লোককে, যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করল, যাকে খুশি মেরে ফেলল—অথচ কেউ কোন খোঁজ খবর পর্যন্ত করল না বাইরে থেকে?'

'কন্ট্র্যাক্ট সই করবার সময়ই ভুলটা করেছি আমরা। দুনিয়ার সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যে গোপনে কাজ করবার কথা, দেড় বছরের মধ্যে কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারব না সেই রকম খত দিয়েই এসেছিলাম আমরা কাজে। তাই কেউ কোন খোঁজ নেয় না। মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখতে বলা হয় বাড়িতে। সে চিঠির প্রতিটা লাইন পড়ে দেখে ওরা। প্রয়োজন হলে আবার নতুন করে লেখায়। একটা বেফাঁস শব্দ লেখার উপায় নেই।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'প্রথম দেড়টা মাস আমরা মনে করেছিলাম সত্যিই বুঝি অ্যাকোয়াসিটি তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা···হুড়মুড় করে যন্ত্রপাতি আসছে, ধুমধাম কারবার। তারপরই টের পেয়ে গেলাম আমরা কিসের পাল্লায় পড়েছি। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে, হাত-পা বাঁধা আমাদের। এইবার, সাবধান, এসে গেছি মেইন কন্ট্রোলরুমে।'

প্রকাণ্ড একটা ঘরে ঢুকল রানা তার লোক লস্কর নিয়ে। ঘরের ঠিক মাঝখানটায় একটা পুরু কাঁচের পার্টিশন। ওপাশে মনিটর, নানান সাইজের ডায়াল, ফ্ল্যাশিং কন্ট্রোল আর কয়েক সারি পুশবাটন দেখে রানার কাছে মনে হলো বিশাল কোন প্লেনের ককপিট দেখছে সে। একপাশে মস্ত এক কমপিউটার ইউনিট দেখে চট করে মনে এল ওর মিসাইল ট্র্যাকিং স্টেশনের কথা। পাশাপাশি পাঁচটা চেয়ারে বসে রয়েছে পাঁচজন লোক সার বেঁধে।

'ওই লম্বা লোকটা দেখছেন,' চাপা গলায় কথা বলে উঠল সান্তানা, 'একেবারে বাঁয়ে বসা—ওইটাই পালের গোদা।'

'চিনি আমি।' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'ওরই নাম কবির চৌধুরী।'

ওপাশের দেয়ালের গায়ে মস্ত বড় একটা কাঁচ বসানো। তার ওপাশে একটা সাবমেরিনের বিভিন্ন অংশে কাজ করছে অনেকগুলো টেকনিশিয়ান। তাদের সঙ্গে কথা বলছে কবির চৌধুরী একটা ইন্টারকমের সাহায্যে। ভোঁতা নাকের প্রায় গোলাকার সাবমেরিন বিশাল বাথটাবের মত দেখতে একটা পাত্রে বসানো রয়েছে। চারপাশ থেকে আট দশটা ক্রেন ওটার বিভিন্ন অংশ টেনে ধরে রেখেছে।

'অ্যাটমিক পাওয়ারড্ মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক ধরেছেন। দেখছেন দেখেন, কিন্তু থামবেন না। বাঁ দিকের তৃতীয় এলিভেটর-শ্যাফটের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি আমাদের। ওইখানে ঢুকে আর এক স্তর নিচে নামতে হবে আমাদের। পালের গোদার পাশে বসা এক থুথুড়ে বুড়ো দেখতে পাচ্ছেন?' রানা দেখেছে এবং চিনেওছে। প্রফেসার ব্র্যাভ। 'ওই হচ্ছে এটার আবিষ্কর্তা। কি এক অ্যাটমিক রিওস্ট্যাটের জোরে অনির্দিষ্টকালের জন্যে সমুদ্রের ছ'হাজার ফুট নিচ দিয়ে অনায়াসে চলাচল করতে পারে। এটা নিয়ে গর্ব করতে শুনেছি আমি ওদের। এটার মাথার ওপর নাকি মিসাইল ছোঁড়ার জন্যে ভার্টিক্যাল লঞ্চিংটিউব আছে। যে কোন সমুদ্রের দু'হাজার ফুট গভীরে থেমে দাঁড়াবে, রেডিও ফিক্স আর স্টার-ট্র্যাকার পেরিস্কোপের সাহায্যে টার্গেট-পিন ডাউন করা কিচ্ছু না—তথ্যগুলো মিসাইলের ব্রেনে ফিড করলেই হলো। তারপর একটা বোতাম টিপলেই কম্প্রেস্ড্-এয়ারের সাহায্যে ছুটল মিসাইল পানির মধ্যে দিয়ে। যেই পানি ছেড়ে ওপরে উঠবে, ওমনি ইগনিশন হবে সলিড-ফুয়েল রকেটে, আকাশে উঠেই আপনা থেকেই কোর্স কারেকশন হবে। ব্যস···যেখানে খুশি সেখানে, ভিড়িম্!'

এলিভেটরে উঠেও বকবকানি থামল না রয় সান্তানার। ডক্টর জিমি ক্লিদারোকেও দেখেছে রানা ব্র্যাভের পাশে। সবাই এখানে এসে হাজির হওয়া মানে পরিকল্পনার শেষ স্তরে চলে এসেছে ওরা, ঘনিয়ে এসেছে বিপদ। কিন্তু কি সেটা? সান্তানার কথা থেকে কিছুই বোঝা গেল না। শুধু জানা গেল যে যদিও প্রত্যেকটা জিনিসের নক্সা তৈরি করে দিয়েছে প্রফেসার ব্র্যাভ, পদে পদে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছে লোকটা এদের কাজে, বার বার গোঁ ধরেছে অসহযোগিতার, বার বার নানান ধরনের হুমকি দিয়ে পথে আনতে হয়েছে তাকে।

নীরবে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। সান্তানার কণ্ঠ ভেসে এল আবার। 'রেডিও কন্ট্যাক্ট কেটে দিন। এখুনি ঢুকব আমরা টিউবে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য জিনিস দেখবেন আজ।'

রিবিদার পরা দু'জন গার্ড ইঙ্গিত করল রানাকে হাতকড়াগুলো খুলে দেয়ার জন্যে। সবাইকে মুক্ত করা হলে ছাগল তাড়ানোর মত তাড়িয়ে ঢোকানো হলো ওদের একটা গোলাকার ডিকমপ্রেশন চেম্বারে। একটা লম্বা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে সুয়েরেজ পাইপের মত দেখতে মসৃণ অ্যালুমিনিয়ামের

পাইপের মধ্যে। লম্বালম্বি ভাবে শোয়ানো হলো সবাইকে ট্রেনের ওপর, বেঁধে দেয়া হলো স্ট্র্যাপ। সবার শেষে রানা।

রানাকে বাঁধা হতেই একটা বোতামে টিপ দিল একজন গার্ড। মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল রানার সর্ব শরীর। আশ্চর্য দ্রুত বেড়ে চলেছে ট্রেনটার গতি। চোখ খোলার চেষ্টা করেও পারল না সে। বুলেটের বেগে ছুটে চলেছে ট্রেনটা। ষাট সেকেন্ডও পার হয়নি, রানা টের পেল গতি কমে আসছে ট্রেনের, ঠিক যেন বাতাস পোরা নরম বালিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ট্রেনটা।

একে একে বাঁধন খুলে নামানো হলো সবাইকে, ডিকমপ্রেশনের পর বের করে দেয়া হলো চেম্বার থেকে। এবার আর হাতকড়া পরানো হলো না ওয়ার্কারদের হাতে। সান্তানার গলা ভেসে এল আবার 'রেডিও কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে এখন। সামনের টানেল ধরে আগে আগে চলুন। তবে সাবধান, এখানেও মনিটর আছে।'

বেশ খাড়াভাবে উঠে গেছে গুহাটা। পাথুরে মাটি। দেয়ালের গায়ে কিছুদূর পর পর লাইট লাগানো। মাথার ওপর দিয়ে সড়সড় করে পেছন দিকে সরে যাচ্ছে একটা কনভেয়ার বেল্ট—ছোট বড় নানান আকারের পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওটা। তার মানে টানেলের কাজ চলছে এখনও। আশ্চর্য একটা ব্যাপার লক্ষ করল রানা—আওয়াজের চোটে কানে তালা লেগে যাওয়ার কথা, কিন্তু কোন শব্দ নেই কোথাও।

'আমরা কোথায় এখন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'সিসি থেকে ছাব্বিশ মাইল উত্তরে,' উত্তর এল সান্তানার। 'ভ্যাকিয়ুম টিউবটা কেমন বুঝলেন?' সান্তানার কণ্ঠে গর্বের আভাস। 'আইডিয়াটা মিস্টার বিগের ঠিকই, কিন্তু জিনিসটা তৈরি করেছি আমরা নিজের হাতে। আশ্চর্য কবির চৌধুরীর মাথা! কি সহজ একটা প্রিনসিপল্‌কে সুন্দর কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। টিউবের একপাশ থেকে বাতাসের ধাক্কা দিয়ে ট্রেনটাকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে আরেক পাশে। ভ্যাকিয়ুমের মধ্যে দিয়ে বুলেটের বেগে এগিয়ে শেষ মাথায় বাতাসের ধাক্কায় থামছে আবার। এর সঙ্গে লেভিটেশন প্রিনসিপল্‌ যোগ হওয়ায় আরও বেড়েছে গতি। পুরো চারটে মাস লেগেছে আমাদের পাইপগুলো ঠিকমত সেট করতেই। ছাব্বিশ মাইল··· সোজা কথা না!'

'সমুদ্রের নিচ দিয়ে?'

'হ্যাঁ। কাজ চলছে এখনও। কোথায় চলেছে জানি না, তবে আমার মনে হয় কোন আর্মি বা এয়ার বেস অ্যাটাক করতে চায় লোকটা মাটির নিচ দিয়ে টানেল খুঁড়ে।'

চুপ করে রইল রানা। লি-বিউসে মিসাইল ইনস্টলেশনের অবস্থান ভাল করেই জানা আছে ওর। সেই বেসের তলায় রয়েছে ওরা এখন। ওপরে টহল দিচ্ছে প্রহরী, জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে কড়া পাহারা—কিন্তু ঠেকানো গেল কথায়? ঠিক জায়গা মত পৌঁছে গেছে কবির চৌধুরী!

হাইস্পীড কমপ্রেশন ড্রিল নিয়ে কাজ করে চলেছে সামনেই চব্বিশজনের

একটা দল। পাথর খুঁড়ে এগোতে হচ্ছে এখানে, অথচ শব্দ নেই, কোন ভাইব্রেশন নেই। সান্তানাকে জিজ্ঞেস করায় হেসে উঠল সে। 'এটাও সেই বিগ ব্রাদারের কারসাজি। লোকটার যে দুর্দান্ত একটা ব্রেন আছে সেকথা শত্রুরও স্বীকার না করে উপায় নেই। অডিফায়ার বলে একটা যন্ত্রের সাহায্যে সেকেন্ডে বিশ হাজার সাইক্‌লস্‌ রেডিও ফ্রীকোয়েনসি পাওয়ার তৈরি করা হচ্ছে, তারপর সেটাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে মেকানিক্যাল এনার্জিতে, যার ফলে শব্দটাকে খেয়ে নিচ্ছে ভাইব্রেশন। নানান কৌশলে এই ভাইব্রেশনও মেরে দেয়া হচ্ছে। ফলে দুই হাত তফাৎ থেকেও শব্দ বা ভাইব্রেশন টের পাওয়ার উপায় নেই। অনেক রকম যন্ত্র এনে টেস্ট করে দেখা হয়েছে। কোন ইন্সট্রুমেন্টেই কোন কিছু রেজিস্টার করে না। আমরা যদি কোন ফিল্ড মার্শালের চেয়ারের তলায় গিয়ে উঠি, টের পাবার রাস্তা নেই তার। এইবার ওই গার্ডটার সামনে গিয়ে বলুন: শিফট চেঞ্জ। এটা বললেই ওরা ফিরে যাবে, আমরা কাজ ধরব। আগামী তিন ঘণ্টা আমাদের শিফট। যখন তখন হান্টার চালাতে দ্বিধা করবেন না। নইলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

তুমুল বেগে কাজ চলল দুটো ঘণ্টা। তারপরেই রানার বেল্টে ফিট করা একটা বাযার বেজে উঠল ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের মত। ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল সে একটা কাঁচঘেরা বুদের মধ্যে বসে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে চীফ টেকনিশিয়ান। এতক্ষণ ড্রিলিং অপারেশন পরিচালনা করছিল লোকটা বুদে বসে। পায়ে পায়ে এগোল রানা বুদের দিকে, টিপে দিল লাল বোতামটা। পরিষ্কার ইংরেজি শুনতে পেল সে এয়ারফোনে।

'বড় সাহেব কথা বলতে চান তোমার সঙ্গে।' ইঙ্গিত করল লোকটা মনিটরের দিকে।

কবির চৌধুরী! মনিটর স্ক্রীনের মধ্যে দিয়ে সোজা চেয়ে রয়েছে রানার চোখের দিকে। ভিতর ভিতর হোঁচট খেল রানা। ওর চেহারাও কি দেখতে পাচ্ছে কবির চৌধুরী? পরমুহূর্তে মাস্কের কথা মনে পড়ায় নিশ্চিন্ত হলো, দেখতে পেলেও চিনতে না পারার সম্ভাবনাই বেশি। ধরা যদি পড়ে তাহলে পড়বে কথা বলতে গিয়ে। যথাসম্ভব হুঁ হাঁ দিয়ে কাজ সারবে বলে মনস্থির করে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল মনিটরের সামনে।

'তোমার লোকজন নিয়ে ফিরে এসো এখুনি,' পরিষ্কার বাংলায় ভেসে এল কবির চৌধুরীর নির্দেশ। 'চীফ ইঞ্জিনিয়ার জানাচ্ছে, আর দশ ইঞ্চিও নেই, মেঝে পর্যন্ত পৌঁছে গেছি আমরা। আপাতত কাজ শেষ। তোমার লোকজনকে সেল ব্লকে পুরে দিয়ে তুমি ফিরে আসবে ডিকমপ্রেশন চেম্বারে। স্পেশাল অ্যাসল্ট পার্টিতে তুমিও আছ। ইতিমধ্যে ভেতর থেকে যা ব্যবস্থা করার সেরে রাখবে ফ্রলিন। আমরা শুধু যাব আর উঠিয়ে নিয়ে আসব। দেরি কোরো না, কুইক।' মিলিয়ে গেল কবির চৌধুরীর ছবি।

ফিরতি পথে দ্রুত চলতে শুরু করল রানার ব্রেন। লি-বিউসে মিসাইল ইনস্টলেশন থেকে কিছু একটা চুরি করবার পরিকল্পনা নিয়েছে কবির চৌধুরী।

কি সেটা? যাব আর উঠিয়ে নিয়ে আসব শুনে বোঝা যাচ্ছে গোটা পি এইচ ও মিসাইল চুরি করবার প্ল্যান নেই ওর। ভ্যাকিয়ুম টিউবের মধ্যে দিয়ে পার করা যাবে না ওটাকে। তাহলে? নিশ্চয়ই স্পেশালাইজড্ কমপিউটার ব্রেনটাই ওর লক্ষ্য। ওটা আকারে একটা মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়ে বড় হবে না। এই ব্রেনটা ফিট করবে কবির চৌধুরী ব্র্যান্ডের সুপার সাবমেরিনে। তারপর সমুদ্রের ছয় হাজার ফুট নিচ দিয়ে উধাও হয়ে যাবে—কোথায় কে জানে। কারও সাধ্য নেই ঠেকায়। সমুদ্রের অত গভীরে পৌঁছতে সময় লাগবে, কাজেই ইতোমধ্যে যেন কেউ এই চুরির ব্যাপারটা টের না পায় সেজন্যে খুব সম্ভব উড়িয়ে দেবে সে গোটা লি-বিউসে মিসাইল ইনস্টলেশন। তার মানে শেষ হয়ে যাচ্ছে সোহানা। র‍্যাডিয়েশনের ফলে কেউ ঢুকতে পারবে না ওখানে পুরো তিনটে দিন। সে সুযোগে পগার পার হয়ে যাবে কবির চৌধুরী। তারপর কতটা ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞে নামবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে কখন ওর কি মুড হয় তার ওপর।

ফিরে এল রানা ওর দল নিয়ে সিসিতে। মোটামুটি একটা প্ল্যান ঠিক করে নিয়েছে সে। ঘড়ি দেখল। সাড়ে ন'টা। এদিকটা সামলাতে পারবে সে আশা করা যায়, কিন্তু ওদিকে সোহানা ফ্রলিন লটেনবাককে সামলাতে পারলে হয়। যাই হোক প্ল্যানটা দলের সবাইকে জানানো দরকার। ডিকমপ্রেশন চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোতে এগোতে সান্তনাকে বলল সে, 'হাতে সময় নেই। সবাইকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। কাছে পিঠে মনিটর সিসটেমের কোন ব্লাইন্ড স্পট থাকলে সেইদিকে চলুন।'

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল। কিন্তু রয় সান্তানার কণ্ঠে নয়—কবির চৌধুরীর কণ্ঠে।

'মাসুদ রানা! বড় বেশি বেড়ে গেছ তুমি! সাত নম্বর ভেন্টিলেটিং টানেলে পাওয়া গেছে গার্ডের মৃতদেহ। চারপাশটা একবার চেয়ে দেখো, তারপর সাবধানে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখো সাবমেশিনগান। চারদিকে নজর করলেই বুঝতে পারবে, বাধা দেয়া অর্থহীন।'

পাঁই করে ঘুরল রানা। পেছনেই একটা টানেলের স্টীলের দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ডানধারে নেমে এসেছে একটা এলিভেটর, দরজা খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বামধারে নামল আর একটা এলিভেটর, সেটারও দরজা খুলে যাচ্ছে। দুই খোলা দরজা দিয়ে দুই দল সাবমেশিনগানধারী এগোল ওদের দিকে।

তেরো

'জিরো আওয়ার, টোয়েন্টিনাইন মিনিট্স্, থার্টি সেকেন্ডস্··· টেলিমিটার

কন্ট্যাক্ট…ট্যাঙ্ক প্রেশার ওকে…গাইরস্ ওকে…রকেট ট্যাঙ্ক প্রেশার কারেক্ট…'

ধাতব কণ্ঠস্বরে যান্ত্রিক ভঙ্গিতে কাউন্টডাউন চলেছে লি-বিউসে ইনস্টলেশনে।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে রয়েছে রাডার স্ক্যানারগুলো। ওদিকেই রওনা হবে মিসাইল আর সাড়ে উনত্রিশ মিনিট পর—পড়বে গিয়ে পাঁচ হাজার মাইল দূরে আটলান্টিকের একটা নির্দিষ্ট এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শনের জন্যে আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে একটা জাহাজ। চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে লি-বিউসের সর্বত্র। আজকের দিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওদের সবার কাছে, এতদিনের কঠোর পরিশ্রম সার্থক হলো কি হলো না জানতে পারবে তারা আর আধঘন্টার মধ্যেই। সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের প্যানেলে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ হরেক রঙের ছোট ছোট বাতি জ্বলছে নিভছে।

বিভিন্ন সেকশনের হেডদের কাছ থেকে মেসেজ আসছে মুহুর্মুহ ইন্টারকমিউনিকেশন সিসটেমের মাধ্যমে।

মেইন ব্লকের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে সেঁটে দাঁড়াল সোহানা। গার্ডদের গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফ্রলিন লটেনবাক। মোটা একটা কেবল্ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে সিলোকে লঞ্চিং সাইটের সঙ্গে, সেটা ডিঙিয়ে এগিয়ে গেল ফ্রলিন দ্রুত পায়ে। আবার শোনা গেল কাউন্ট ডাউন। আটাশ মিনিট আছে আর।

সোহানা দেখল অটল পর্বতের মত পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিফর্ম পরা সেন্ট্রি দু'জন গায়ে গা ঠেকিয়ে। মাথা নেড়ে বারণ করছে ফ্রলিনকে। আঙুল তুলে লাল ওয়ার্নিং লাইটটা দেখাল একজন, বুড়ো আঙুল দিয়ে দেয়ালের গায়ে আঁটা একটা নোটিশ-বোর্ডের দিকে দেখাল দ্বিতীয়জন। ওতে লেখা রয়েছে: কাউন্ট-ডাউন শুরু হওয়ার পর এই গেটের ওপাশে যাওয়া নিষিদ্ধ।

হাতের ব্যাগটা খুলে অনুমতিপত্র বা ওই জাতীয় কিছু বের করবার ভঙ্গি করল ফ্রলিন। হঠাৎ চমকে উঠল সোহানা। পড়ে যাচ্ছে সেন্ট্রি দু'জন। দ্রুত একবার চারপাশে চেয়ে নিয়ে প্রায় দৌড়ে চলে গেল ফ্রলিন সিলোর দিকে।

ছায়া থেকে সরে পিছু নিল সোহানা। সেন্ট্রিদের দিকে একনজর চেয়েই বুঝতে পারল নার্ভ গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। হয়তো কোন ন্যাসাল স্প্রের বোতলে পোরা ছিল। ফ্রলিনের পিছু পিছু এক ছায়া থেকে আরেক ছায়ায় সরে সরে এগোতে শুরু করল সে। একবার ভাবল ফিরে গিয়ে সিকিউরিটি চীফকে জানাবে কিনা, পরমুহূর্তে বুঝতে পারল এখন কাউকে খবর দেয়ার সময় নেই। কি করতে চলেছে সে ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ বা দ্বিধার ভাব নেই ফ্রলিনের চালচলনে। সব কিছুই আগে থেকে প্ল্যান করা। যা করবার অত্যন্ত দ্রুত করবে ফ্রলিন, কাজেই এখন আর কাউকে ডাকাডাকি করে সময় নষ্ট না করে বাধা দিতে হবে ওকেই।

সিলোর দেয়াল ঘিরে বাইরে থেকে গোল হয়ে ঘুরে যে লোহার মইটা নেমে গেছে নিচে সেটা ধরে নামতে শুরু করেছে ফ্রলিন। বাঁক ঘুরে অদৃশ্য

হয়ে গেল। দৌড়ে চলে এল সোহানা সিলোর পাশে। সামনে ঝুঁকে দেখল বিশাল একটা বন্দুকের ব্যারেলের মত ঝকঝক করছে ভিতরটা। পঞ্চাশ ফুট নিচ থেকে খাড়া উঠে এসেছে মসৃণ ধাতুনির্মিত ইঁদারাটা। ত্রস্তপদে নেমে যাচ্ছে ফ্রলিন। কয়েক ফুট বাকি থাকতে রেলিং টপকে দু'হাত দু'দিকে তুলে সরু একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে ইঁদারার গায়ে বসানো একটা দরজার কাছে পৌঁছে গেল সে, তারপর দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। জুতো জোড়া খুলে ঘোরানো সিঁড়ি ঘেয়ে ঝড়ের বেগে নামতে শুরু করল সোহানা।

পাঁচটা মিনিট নষ্ট হয়ে গেল সোহানার কেবল দরজাটা খুলতেই। নানানভাবে চেষ্টার পর ভিতর থেকে হয়তো তালা লাগিয়ে দিয়েছে ভেবে যখন হাল ছেড়ে দিয়ে লোকজনকে খবর দেবে কিনা ভাবছে, এমনি সময় হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই খুলে এল দরজাটা, ফেঁসে গিয়ে আটকে ছিল। খোলা দরজা দিয়ে প্রথমেই চোখ পড়ল সোহানার মেঝের ওপর রাখা হ্যান্ডব্যাগটার ওপর। ব্যাগের চারপাশে ছড়ানো রয়েছে কয়েকটা ছোট বড় রেঞ্চ, স্ক্রু ড্রাইভার, প্লায়ার্স, আরও কিছু অদ্ভুত যন্ত্রপাতি। ভিতরে পা বাড়িয়েই দেখতে পেল সে ফ্রলিনকে। লোহার একটা মইয়ে উঠে মেঝে থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে একের পর এক জটিল তার ডিসকানেক্ট করছে সে। খুব সম্ভব নষ্ট করে দিচ্ছে ওয়ার্নিং সিসটেম। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই চমকে চাইল সে সোহানার দিকে।

'কে আপনি! কি চান আপনি এখানে? জানেন না এখানে ঢোকা নিষেধ?'

নার্ভ গ্যাসের ভয় নেই, কালো টাইটফিট জামায় পকেট নেই, ওটা রয়ে গেছে হ্যান্ডব্যাগের মধ্যেই—কাজেই ধীরে সুস্থে পিস্তলটা তাক করল সোহানা ফ্রলিনের কপাল বরাবর। 'লক্ষ্মী মেয়ের মত নেমে এসো নিচে। কোন চালাকি...'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই সাঁই করে ছুঁড়ে মারল ফ্রলিন আধহাত লম্বা রেঞ্চ একটা, সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিল হ্যান্ডব্যাগটার কাছে পৌঁছবার জন্যে। হাতের তাক লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না, কিন্তু পা বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল ওর সঙ্গে। কব্জির ওপর রেঞ্চের আঘাত লাগায় সোহানার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পিস্তলটা, এক সেকেন্ড দাঁতে দাঁত চেপে চোখ টিপে বন্ধ করে রেখে যন্ত্রণার তীব্রতা সামলে নিয়েই দেখতে পেল সে পালিশ করা মেঝের ওপর পা পিছলে চিৎ হয়ে পড়ে গেছে ফ্রলিন। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথা ভুলে লাফ দিল সোহানা সামনের দিকে।

গড়িয়ে সরে গেল ফ্রলিন, শুয়ে শুয়েই পা চালাল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল সোহানাও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ল সে, ফ্রলিনকে আছড়ে পাছড়ে হ্যান্ডব্যাগটার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। অসম্ভব জোর ফ্রলিনের গায়ে, সোহানাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল সামনের দিকে। উপায়ান্তর না দেখে জুডোর কৌশল অবলম্বন করল সোহানা। হ্যান্ডব্যাগের ওপর দিয়ে ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল ফ্রলিন। নার্ভ

গ্যাসের বোতলটা বের করে নেয়ার চেষ্টা করল সোহানা হ্যান্ডব্যাগ থেকে, কিন্তু ফ্রলিনকে পিস্তলের দিকে এগোতে দেখে দু'পা সামনে এসে কারাতে কিক্ চালাল সে ওর তলপেট লক্ষ্য করে। টাইমিং-এ সামান্য ভুল হয়ে গেল। প্রস্তুত ছিল ফ্রলিন, চট করে পেছনে সরেই চেপে ধরল সোহানার পায়ের কব্জি। খানিকটা ওপরে তুলেই মোচড় দিল সে সোহানার পায়ে। দড়াম করে আছড়ে পড়ল সোহানা, সঙ্গে সঙ্গেই ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রলিন। দুই হাতে বৃষ্টির মত কিল ঘুসি চালাল সে সোহানার চোখেমুখে, হ্যান্ডব্যাগটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল, না পেরে চেষ্টা করল খামচি দিয়ে ওর চোখ অন্ধ করে দেয়ার। ঠিক সেই মুহূর্তে পা দুটো বাঁকিয়ে ফ্রলিনের গলায় বাধিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে পেছনের দিকে ঠেলা দিল সোহানা। ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল ফ্রলিন সোহানার বুকের ওপর থেকে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সোহানা। প্রতিপক্ষও উঠে দাঁড়িয়েছে। গোল হয়ে ঘুরছে দু'জনই। সিলোর ভিতরটা গরম হয়ে উঠছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে দু'জনই, কিন্তু কেউ কাউকে আনতে পারছে না কায়দায়। হঠাৎ একটা ফল্‌স্‌স্টেপ দিয়েই আক্রমণ করে বসল ফ্রলিন। চট করে পাশ ফিরল সোহানা, এবং ওর একটা হাত ধরেই হ্যাঁচকা টান মেরে হিপ থ্রো করল। মাথার ওপর দিয়ে আছড়ে ফেলেও কিন্তু হাতটা ছাড়ল না সোহানা, বেকায়দা মত মুচড়ে ধরে টান দিল ওপর দিকে। কড়াৎ করে শব্দ হলো একটা, সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ফ্রলিন। এইবার নিশ্চিন্তে পিস্তলটার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। দড়াম করে খুলে গেছে দরজাটা।

এক নজরেই বুঝতে পারল সোহানা, বাইরে থেকে এসেছে এসব লোক। বারোজনের একটা দল। রাবার স্যুট আর রিব্রিদার মাস্ক পরা। সামনের জনের চেস্ট স্পীকার থেকে ভেসে এল প্রথমে চীনা, পরে ইংরেজি কয়েকটা শব্দ: 'লয় গী, আর কৃ লার! হারি আপ, গ্র্যাব দেম!'

খপ্ করে ধরে ফেলল একজন সোহানার হাত বজ্রকঠিন হাতে। হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল সোহানা, পারল না, বামহাতে দুই একটা কিল ঘুসি মারতেই সেই হাতটাও ধরে ফেলল লোকটা। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে গেছে বাকি সবাই। প্রত্যেকের জানা আছে ঠিক কোন্ নাটগুলো আলগা করতে হবে বা কোন্ স্ক্রু ঢিল দিতে হবে। মই বেয়ে উঠে গেছে কয়েকজন, দ্রুত হাতে চলেছে কাজ। একটা অ্যাসেটিলিন টর্চ জ্বলে উঠল একজনের হাতে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছে চীনা লোকটা। ইলেকট্রিক সার্কিট ডিসকানেক্ট করতে গিয়ে এখান ওখান থেকে স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে নিচে।

দুই চোখে বিষাক্ত সাপের ঘৃণা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ফ্রলিন। ডান হাতটা ঝুলে আছে পঙ্গু ভঙ্গিতে। চীনা লোকটার দিকে ফিরে বলল, 'এখানেই ফেলে রেখে যাব হারামজাদীকে! ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছুর সঙ্গে!'

রিব্রিদার মাস্কের কাঁচের ওপাশে দাঁতের আভাস দেখা দিল। সোহানার

চিবুকে একটা হাত রেখে বলল, 'কিন্তু চেহারাটা যে সুন্দর লাগছে? এর সঙ্গে একটা রাত···'

মুখটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল লোকটা, কিন্তু তার আগেই একগাদা থু থু ছিটিয়ে দিয়েছে সোহানা ওর মাস্কের কাঁচের ওপর। একটা অত্যন্ত কুৎসিত চীনা গালি মুখস্থ ছিল, সেটা উচ্চারণ করল সে এবার। 'টিউ নার মা!'

থু থু মাখা কাঁচের ওপাশে কঠোর হয়ে উঠল চীনাম্যানের বাঁকা চোখদুটো। এক পা পিছিয়ে গিয়ে ফিরল ফ্রলিনের দিকে। 'ওকে নিয়ে ফিরছি আমি। বিস্ফোরণে মৃত্যু ছাড়াও আরও অনেক ধরনের মৃত্যুর খবর জানা আছে আমার।'

'কিন্তু তাহলে এখানে রেখে যাচ্ছি আমরা কাকে? এখানে তো একজনকে ফেলে যেতে হবে।'

একটা ছোরা দেখা দিল লোকটার হাতে। আচমকা ছুঁড়ে মারল সে ছোরাটা একজন লোকের পিঠ লক্ষ্য করে। মাঝপথে একবার ঝিক করে উঠেই জায়গামত ঢুকে গেল ছোরাটা। রাবার স্যুটের বাইরে বাঁটটা দেখা যাচ্ছে কেবল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে বসে পড়ল লোকটা, দাঁতে দাঁত চেপে পিঠের ওপর কি এসে বিঁধল দেখবার চেষ্টা করল সে হাত বাড়িয়ে, ছুরির বাঁট পর্যন্ত পৌঁছল না হাত, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে মাথাটা নামাল সে মেঝের ওপর।

'ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে।' ঘোষণা করল চীনাম্যান স্পীকারের মাধ্যমে। 'ওর রিব্রিদারটা খুলে এই মেয়েলোকটাকে পরাও।' ঘড়ির দিকে চাইল। 'হাতে সময় নেই। কুইক এভরিবডি।'

চারজন লোক নামিয়ে নিয়ে এল মিসাইলের ইলেকট্রোনিক ব্রেনটা, সাবধানে লাশটার ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে, পরস্পরকে হুঁশিয়ার করতে করতে। রিব্রিদার পরিয়ে পেছন থেকে ঠেলা দিল সোহানাকে একজন দরজার দিকে। সাঁকোটা পেরিয়ে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নামতে নামতে লক্ষ করল সোহানা সিলোর চারপাশে ছোটাছুটি করছে কয়েকজন লোক, ব্যস্ত হাতে তার জুড়ে চলেছে ওরা। অর্থাৎ জায়গামত ফিট করা হয়েছে বোমা। নিচেই গোল গর্তটা চোখে পড়ল ওর। মুহূর্তে বুঝতে পারল সে এত কড়া সিকিউরিটি ডিঙিয়ে কি করে এতগুলো লোক ঢুকে পড়ল এখানে। মাটির নিচ দিয়ে গর্ত খুঁড়ে উঠে এসেছে ওরা।

ঠেলে গর্তের মধ্যে নামানো হলো ওকে।

এক সেকেন্ড দ্বিধা না করে গুলি করল রানা। একবার ডানদিকে, একবার বামদিকে। সার বেঁধে এগোচ্ছিল দুটো দল। সামনে দু'জন দু'জন চারজন—অর্থাৎ, চারজন ছাড়া আর কেউ গুলি করলে নিজেদের লোকের গায়েই লাগবে। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল রানা। দুই সারিরই প্রথম দু'জন চিৎকার করে উঠল, গুলি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ল পেছনের

লোকের গায়ে। সেমি অটোমেটিকে দিয়ে এক গুলিতে ছাতের লাইটটা নিভিয়ে দিয়েই চিৎকার করে উঠল সে: 'শুয়ে পড়ো সবাই, শুয়ে পড়ো!'

এদিকটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল অথচ সামনে সেল ব্লকের বাতি থাকায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা গার্ডদের সিলুয়েট।

'চাবি!' সান্তানার গলা শুনতে পেল রানা। 'আমার হাতকড়া খুলে চাবিটা দিন আমার কাছে, জলদি!'

অন্ধকার সত্ত্বেও সান্তানার হাতকড়া খুলে ওর হাতে চাবিটা ধরিয়ে দিতে পাঁচ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগল না রানার। কবির চৌধুরীর ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'এসব করে কোন লাভ হবে না, মাসুদ রানা। এক্ষুণি অস্ত্র ফেলে দিয়ে সারেন্ডার করো!' কবির চৌধুরীর গলা ছাপিয়ে সান্তানার চিৎকার ভেসে এল: 'মনিটরটা খতম করেন! ওই কোনায়, ছাতে লাগানো কাঁচটা!' একগুলিতেই লক্ষ্যভেদ করল রানা, ঠুস করে কাঁচ ভেদ করে ভিতরে চলে গেল তপ্ত সীসা।

নিহত গার্ডের শরীরে ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে এল দুটো দলই। আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে সাবমেশিনগানের মুখ দিয়ে অনর্গল। আবার দুই পশলা গুলি বর্ষণ করল রানা। নিজের গলা খামচে ধরল একজন গার্ড, আরেকজন পেট চেপে ধরে বসে পড়ল বাঁকা হয়ে। আবার একপশলা গুলি চালিয়ে রিলিজ বাটন টিপে খালি ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে নতুন আর একটা ভরে নিল রানা। রানার পাশ থেকে কয়েকজন শৃঙ্খলমুক্ত ডাইভার নিচু হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দৌড় দিল গার্ডদের দিকে। পাঁচ কদম গিয়েই হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল প্রথমজন গুলি খেয়ে, কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয়জন পৌঁছে গেল নিহত গার্ডদের কাছে, ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়েই তুলে নিল সাবমেশিনগান। ওদের পেছনে পেছনে আরও কয়েকজন পৌঁছে গেছে। তিন দিকের আক্রমণে আধমিনিটের মধ্যে ধরাশায়ী হলো সবক'টা গার্ড। যারা বেঁচে আছে তারাও রা করছে না, ঘাপটি মেরে পড়ে আছে মড়ার মত। অস্ত্র পাওয়া গেছে যথেষ্ট পরিমাণে, ভাবল রানা, এ পক্ষের লোক ক্ষয় মাত্র দু'জন—ভালই বলতে হবে। এবার আর সব বন্দীদের মুক্ত করে এই সেল ব্লক থেকে বেরোবার একটা ফন্দি বের করতে হবে।

'বেরোবার কোন উপায় নেই,' বলল সান্তানা। 'এলিভেটরের কারেন্ট অফ করে দেয়া হয়েছে। সেল ব্লক দু'পাশ থেকে বন্ধ।'

'কোন চিন্তা নেই,' বলল রানা। 'একটা না একটা রাস্তা বেরিয়ে যাবেই।'

মেইন কন্ট্রোলরুমে বসে আছে কবির চৌধুরী। ঘড়ি দেখল। তারপর হাসিমুখে চাইল ডক্টর জিমি ক্রিদারোর চোখের দিকে।

'আর ত্রিশ সেকেন্ড। ঠিক দশটায় চাপ দেব আমি এই লাল বোতামটায়। মাটির সঙ্গে মিশে যাবে লি-রিউসের মিসাইল ইন্সটলেশন।'

চমকে উঠল রানার অন্তরাত্মা। চট করে ঘড়ির দিকে চাইল। তার মানে আধ মিনিটের মধ্যে মারা পড়ছে সোহানা। ঠেকাবার কোন রাস্তা নেই! পরিষ্কার বুঝতে পারল, মনিটর নষ্ট করে দেয়ার পরেও কেন রেডিও কন্ট্যাক্ট বজায় রাখছে কবির চৌধুরী ওর সঙ্গে। যা যা ঘটছে বা ঘটতে চলেছে জানিয়ে মানসিক কষ্ট দিতে চাইছে ওকে কবির চৌধুরী। প্রচ্ছন্নভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, ওর তুলনায় রানা কিছুই না, এত চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারেনি সে কবির চৌধুরীকে, পারবেও না। পরাজয়টা মনে মনে উপলব্ধি করিয়ে চরম শাস্তি দিতে চায় ওকে লোকটা। বুঝিয়ে দিতে চায় ওর কাছে মাসুদ রানা স্টীমরোলারের তুলনায় বিষ পিঁপড়ের চেয়ে বেশি কিছুই নয়—যদি চেপে মারতে চায়, ঠেকাবার সাধ্য নেই রানার।

লাল বোতামটার ওপর আলতো করে একবার হাত বুলাল কবির চৌধুরী। নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে। শুরু করল কাউন্টডাউন। দশ থেকে নামতে নামতে থামল এসে শূন্যে।

চোখমুখ কুঁচকে গেল রানার। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে শব্দ বা ঝাঁকুনি টের পাবে মনে করে। কিন্তু কোন শব্দ এল না। ঝাঁকুনিও না। এতদূর থেকে আসতে সময় লাগবে। সোহানার মুখটা ফুটে উঠল মানসপটে। এই মুহূর্তে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারল রানা ঠিক কতটা ভালবাসে সে সোহানাকে। মনে হচ্ছে কলজেটা মুচড়ে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে কেউ।

'একটা পার্ট চুকল,' বলল কবির চৌধুরী। 'এবার দ্রুত সারতে হবে আমাদের বাকি সব কাজ।' এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই চারজনে মিলে মিসাইল ব্রেনটাকে সাবধানে বয়ে নিয়ে উঠে পড়ল ওতে গার্ডরা। 'এটাকে সাবমেরিনে তোলা হয়ে গেলেই কাজ আমাদের শেষ।'

'সেল ব্লকে কি চলছে এখন?' জিজ্ঞেস করল ক্রিদারো।

'জানি না।' জবাব দিল কবির চৌধুরী। 'আপাতত ওদের নিয়ে কোন চিন্তা নেই। দু'পাশ থেকে আটকে দেয়া হয়েছে। তুমি ব্যান্ডের খবর নাও, সাবমেরিনের ভেতর ব্রেন রিসিভ করবার প্রস্তুতি সব সারা হয়েছে কিনা জেনে জানাও আমাকে।'

'আর এ মেয়েটার কি ব্যবস্থা করব?'

'ওকে আটকে রাখো কোন ঘরে। লি স্যুর বোধহয় খুব পছন্দ হয়েছে ওকে। কিন্তু সাবধান, এখনই সুযোগ দিয়ো না যেন—অনেক কাজ পড়ে রয়েছে ওর।'

একটা মাইক্রোফোন হাতে তুলে নিয়ে তড়বড় করে নানাদিকে নির্দেশ দিতে শুরু করল ক্রিদারো।

কবির চৌধুরীর কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে রানা। কেমন যেন খটকা লাগল ওর মনে। কাকে পছন্দ হয়েছে লি স্যুর? সোহানা নয়তো? কিন্তু এই আশাকে মনে স্থান দিতে ভরসা পেল না সে। মন থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়ে এখান থেকে বেরোবার ব্যবস্থা করতে হবে এখন।

সবকিছু রেডি আছে জানতে পেরে প্রফেসার ব্র্যান্ডকে সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে আসবার নির্দেশ দিল কবির চৌধুরী। মিনিট খানেক পর দেখা গেল হ্যাচের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছেন বৃদ্ধ ছড়িতে ভর দিয়ে। দুজন গার্ড দুপাশ থেকে সাহায্য করছে তাঁকে। টলোমলো পায়ে স্টীলের গ্যাঙওয়ে বেয়ে এগিয়ে আসছেন তিনি। ধৈর্য হারিয়ে ফেলল কবির চৌধুরী দেরি দেখে। হুকুম করল, 'বয়ে নিয়ে এসো ওকে। দেরি করিয়ে দিচ্ছে অনর্থক। এত সময় নেই আমাদের হাতে।'

প্রফেসার ব্র্যান্ড এসে কন্ট্রোল রুমে ঢুকতেই একটা বোতামে চাপ দিল কবির চৌধুরী। হড়হড় করে সাগর থেকে পানি এসে ভর্তি হয়ে গেল বিশাল বাথটাব। আরেকটা বোতাম টিপতেই ঢিল দিতে শুরু করল ক্রেনগুলো।

'ডাইভিং টীম রেডি?' জিজ্ঞেস করল চৌধুরী নিচু গলায়।

'রেডি, স্যার।' উত্তর এল কাঁচের ওপাশ থেকে।

ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে চাইল কবির চৌধুরী। পঁচিশজন মাস্ক, ফ্লিপার আর অক্সিজেন রিব্রিদার পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তুত হয়ে।

'মিসাইল ব্রেন নামাবার জন্যে তৈরি হয়েছে?'

'ওয়াটারপ্রুফিং কমপ্লিট, স্যার। আমরা রেডি।'

'ভেরি গুড। এবার স্লেডের ওপর তুলে ফেলো ওটাকে।' চট করে পাশ ফিরে ব্র্যান্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রেশার কত এখন?'

'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সাঁইত্রিশ পাউন্ড,' বলল প্রফেসার দুর্বল কণ্ঠে। 'বাইরের সমুদ্রেও এই একই প্রেশার। গেট খুলে দিতে পারেন ইচ্ছে করলেই।'

একটা সুইচে টিপ দিল কবির চৌধুরী। দু'পাশে সরে গেল একটা মস্ত লোহার গেট। সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো কৌতূহলী মাছ ঢুকে পড়ল ভিতরে। সামনে ঝুঁকে আরেকটা সুইচ টিপে যোগাযোগ স্থাপন করল চৌধুরী সাবমেরিনের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। 'সব ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন? আর ইউ রেডি?'

সঙ্গে সঙ্গেই একটা মনিটরে ভেসে উঠল চুরুট কামড়ে ধরা একটা বাঁকা মুখ। চুরুটটা দাঁতে চেপে রেখেই উত্তর দিল সে, 'এভরিথিং রেডি, স্যার। অ্যাওয়েটিং ইয়োর অর্ডার।'

'ও. কে.। এখান থেকে বের করে সাগরের ফ্লোরে নিয়ে যাও সাবমেরিন। ফরওয়ার্ড হ্যাচ খুলে মিসাইল টিউবে পানি ভর্তি করে তৈরি হয়ে যাও। ইলেকট্রোনিক ব্রেনসহ স্লেডটা আমি রওনা করে দিচ্ছি এক্ষুণি।'

সেল ব্লকের সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করা হয়েছে হাতকড়া খুলে দিয়ে। বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি। অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল ওরা রানাকে। সবাই অপেক্ষা করছে পরবর্তী নির্দেশের।

রানা বুঝতে পারল এখান থেকে বেরোবার উপায় উদ্ভাবন করতে হলে সবার সাহায্য নিতে হবে ওকে। কাজেই শুরু করল প্রশ্ন।

'এখান থেকে আমাদের কথাবার্তা বাইরে থেকে শোনার কোন ব্যবস্থা আছে?'

মাথা নাড়ল সামনের কয়েকজন।

'ক'টা দরজা এই সেলের?'

'মেইন গেট ছাড়াও আরও চারপাঁচটা দরজা আছে, কিন্তু সব তালা মারা।' জবাব দিল রয় সান্তানা।

'তালা কোন সমস্যা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে ওই দরজা দিয়ে বেরোলে কোন্ অংশে পৌঁছুচ্ছি আমরা। আন্ডারগ্রাউন্ডের মোটামুটি একটা নকশা এঁকে দেখাতে পারবেন কেউ আমাকে?'

একজন ছুঁচোমুখো লম্বা লোককে ঠেলে এগিয়ে দেয়া হলো সামনে। একটা সাদা কাগজের ওপর ঘ্যাসঘ্যাস করে এঁকে ফেলল লোকটা চমৎকার একটা নকশা। গোড়া থেকে ব্যাখ্যা শুরু করতে যাচ্ছিল লোকটা, ওকে বাধা দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল: 'নক্সার মধ্যে এই সেলটা কোথায়, দেখান।' একটা লম্বাটে জায়গায় লোকটা আঙুল রাখতেই পাঁচ সেকেন্ড নক্সাটার দিকে চেয়ে থেকে মনের মধ্যে গেঁথে নিল। তারপর বলল, 'এবার দরজাগুলো এঁকে দেখান।' চারটে দাগ দিল লোকটা দু'পাশের দেয়ালে। 'এসব দরজার ওপাশে কি?'

'এখন কি আছে জানি না। আগে ছিল স্টোর। মাস ছয়েক হলো পড়ে আছে বন্ধ অবস্থায়।'

'বেশ। দেখে নেয়া যাক আগে।' চার মিনিটও লাগল না স্টিলেটোর সাহায্যে চারটে দরজার তালা খুলতে। একটা সম্পূর্ণ খালি, বাকি তিনটেয় ভাঙাচোরা বাতিল জিনিসপত্র ঠাসা—কোনটাতেই বাইরে বেরোবার কোন দরজা নেই। স্টোরের প্রত্যেকটা জিনিস উল্টেপাল্টে দেখল রানা—অকেজো অক্সিঅ্যাসেটিলিন টর্চ, হ্যান্ড ড্রিল, রিবিদার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, একগাদা ফ্লিপার, হাঙর মারা ছোরা, আন্ডার-ওয়াটার সিওটু গান, স্পিয়ার, আরও কত কি। ফিরে এসে এই নক্সার ওপরেই ভেন্টিলেশন সিস্টেম এঁকে দেখাতে বলল রানা। এগিয়ে এল রয় সান্তানা—ওরই জানা আছে ভাল। আবার পাঁচ সেকেন্ড একদৃষ্টে নক্সার দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'এই সেল ব্লক পশ্চিমে খালি কেন? কি আছে ওদিকটায়?'

'সমুদ্র। দেখছেন না, কেমন স্যাঁৎসেঁতে হয়ে আছে ঘরটা?'

'এখান থেকে সরাসরি সমুদ্রে বেরোবার কোন পথ নেই? ভ্যাকিয়ুম টিউব বসাবার সময় ব্যবহার করেছেন, এমন কোন পথ?'

কয়েক মুহূর্ত ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে থাকল সান্তানা, তারপর অনেকটা আপন মনেই বলল, 'টেরিফিক প্রেশার হবে। সেবলের কাছে যা বারুদ আছে তাই দিয়ে ধসিয়ে দেয়া অসম্ভব নয়। উইক পয়েন্ট আছে ওটার। ইচ্ছে করেই অ্যাকসেস ডোরটা শোলডারিঙের সময় দুর্বল রাখা হয়েছিল, কবির চৌধুরীর নির্দেশে। মাই গড!' হঠাৎ গলার স্বর চড়ে গেল ওর কয়েক পর্দা। 'আমাদের

বলা হয়েছিল, যদি কখনও আবার দরকার হয়, সেইজন্যে পাকাপাকিভাবে বন্ধ করা হচ্ছে না দরজাটা! জেসাস! আসলে ডুবিয়ে মারবে ও আমাদের! আমাদের প্রয়োজন ফুরোলেই লিম্পেট মাইনটা ফাটিয়ে দেয়ার প্ল্যান ছিল ওর আসলে। নিজের হাতে ফিট করেছিলাম আমি মাইনটা। একটা বোতামে চাপ দিলেই শেষ হয়ে যাব আমরা সব!'

'তার আগে আমরাই ফাটাব ওটাকে,' বলল রানা। 'এখন ও ব্যস্ত আছে অন্য কাজে। যা করার জলদি করতে হবে আমাদের।'

'কি করব?' সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন করল কয়েকজন। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওদের মুখের রঙ।

'মরার ভয় দূর করুন প্রথমে। প্যাঁকে পড়েছি যখন, যেমন খুশি তেমনিভাবে মারতে পারে ও আমাদের। যদি প্যাঁকেই রয়ে যাই, মারবেও। ভেন্টিলেশন যদি ক্লোজ করে দেয়, কি করবেন দম আটকে মরা ছাড়া?'

'সত্যিই তো, কি করব?'

'দুটো রাস্তা আছে।' ছাতের দিকে চাইল রানা। অস্বাভাবিক উঁচু ছাত। কম করে হলেও বিশ ফুট হবে। ঠিক মাঝখানটায় দুইফুট ব্যাসের একটা বৃত্ত দেখা যাচ্ছে। ভেন্টিলেশন শ্যাফটের চোঙ একটা।

রানাকে ওপর দিকে চাইতে দেখে নক্সা-শিল্পী বলল, 'ওটার কথা ভেবে দেখেছি আমরা কয়েক মাস আগেই। ওই পথ দিয়ে টানেল ধরে মনিটর বাঁচিয়ে এই গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব—যদি অস্ত্র থাকে। অস্ত্র আছে এখন আমাদের কাছে কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, ওই উঁচুতে পৌঁছতে হলে একমাত্র পথ হচ্ছে একজনের কাঁধে আরেকজন, তার কাঁধে আরেকজন এই ভাবে উঠে যাওয়া। সবাইকে বের করে দেয়া যায় এইভাবে, কিন্তু বাকি ক'জন? যারা কাঁধ দিয়ে সাহায্য করল সবাইকে ওপরে উঠে যেতে, তারা বেরোবে কি করে?'

'ঠিকই বলেছেন,' বলল রানা। 'অন্তত বিশজনকে দাঁড়াতে হবে নিচে আর সবাইকে পার করতে হলে। এরা আর ওই পথে বেরোতে পারছে না। কিন্তু আবার সমুদ্র পথে যদি বেরোবার চেষ্টা করা যায়, যাদের রিব্রিদার নেই তারা সব মারা পড়বে। কাজেই দুইভাগ হয়ে গিয়ে দু'দিক থেকেই বেরোব আমরা—কেউ পড়ে থাকব না এখানে। বুঝতে পেরেছেন? দুই দলের ওপর দুই ধরনের দায়িত্ব থাকবে। যারা ভেন্টিলেশন টানেল বেয়ে উঠবে তারা পঁচিশটা সাব-মেশিনগান পাচ্ছে, কোথাও বাধা পেলেই গুলি ছুঁড়ে পথ করে নিতে পারছে—কাজেই আশা করা যায় উঠে যেতে পারবে তারা ওপরে। তাদের কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা স্পীডবোট, হাইড্রোফয়েল, বার্জ দখল করে স্টার্ট দিয়ে বাকি ক'জনের জন্যে অপেক্ষা করা। আর যারা সমুদ্রপথে বেরোবে তাদের কাজ হচ্ছে পি এইচ ও মিসাইল ব্রেনটা দখল করে নিয়ে ওপরে ভেসে ওঠা। একটা আন্ডার-ওয়াটার স্লেডে করে ওটাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে ওরা সাবমেরিনের উদ্দেশে। সঙ্গে গার্ড আছে। যুদ্ধ করে কেড়ে নিতে হবে·

আমাদের ব্রেনটা।' সবার মুখের দিকে চাইল রানা। 'আমি যাচ্ছি সমুদ্রপথে। আমার সঙ্গে কারা কারা যাবেন হাত তুলুন।'

প্রথমেই হাত তুলল রয় সান্তানা। দেখাদেখি ওর দলের আর সবাই তুলল হাত। শুরু হয়ে গেল কাজ।

স্টোর থেকে যতগুলো দরকার ফ্লিপার, ছোরা আর সিওটু গান বের করে নেয়া হলো। খুঁজতে গিয়ে গোটা কয়েক কমপ্রেস্‌ড্ এয়ার-স্পীড প্যাকও পাওয়া গেল। এদিকে বিস্ফোরণের ব্যবস্থায় লেগে গেছে সান্তানা আর সেবুল, ওদিকে সাবমেশিনগান পিঠে ঝুলিয়ে টপাটপ একজনের পর আরেকজন উঠে যাচ্ছে ওপরে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ভেন্টিলেশন শ্যাফটের চোঙের ভিতর। শেষের দিকে সমুদ্রপথযাত্রীদের দাঁড়াতে হলো কাঁধ দেবার জন্যে—চারজন মেঝের ওপর, তাদের কাঁধে তিনজন, সেই তিনজনের কাঁধে দু'জন, এবং শেষজন তাদের কাঁধে। পিরামিডের মত। এইভাবে মুখোমুখি দুই সারিতে দাঁড়িয়ে দু'দিক থেকে চার হাত-পা ধরে টেনে তুলে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে এক এক জনকে গর্তের মুখে।

সবাইকে পার করে দিয়ে নিজেরা তৈরি হয়ে নিল ওরা একুশজন। চারভাগে ভাগ হয়ে ঢুকে পড়ল চারটে স্টোর রুমে।

'প্রচণ্ড চাপ হবে কিন্তু পানির,' বলল রানা। 'প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হবে আমাদের সবাইকে। তারপর যত শীঘ্রি সম্ভব সামলে নিয়ে ছুটব আমরা সামনের দিকে। কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে সাবমেরিনটা, খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। নিন, তৈরি হয়ে নিন সবাই।'

'সবাই রেডি?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রয় সান্তানা।

রানা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই ফাঁৎ করে ম্যাচ জ্বেলে ধরিয়ে দিল সলতের গায়ে, তারপর একলাফে চলে এল রানার পাশে, স্টোর রুমের ভিতর।

চোদ্দ

বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই হড়হড় করে টন-কে-টন পানি এসে ঢুকল সেল ব্লকের মধ্যে। স্টোররুমের ভিতর থাকায় আসল ধাক্কাটা যদিও এড়ানো সম্ভব হলো, নকল ধাক্কাও আসলের চেয়ে কোনদিক থেকে কম গেল না। রানার মনে হলো চাপের চোটে ভেঙে যাবে ওর হাড়গোড়। বিস্ফোরণের বিঙঙ্ শব্দটা রয়ে গেছে কানের মধ্যে, সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে তীক্ষ্ণ ব্যথা। মনে হলো প্রচণ্ড ধাক্কা দিল কেউ ওর পিঠে, ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে ছুটল ওর দেহটা উন্মুক্ত অ্যাকসেস ডোরের দিকে। মস্ত একটা বেলুনের মত একরাশ বাতাস সাঁ করে উঠে গেল ওপর দিকে, গতি কমাবার চেষ্টা করল সে চার হাত

পায়ের সাহায্যে। নিচের দিকে চেয়ে দেখল পেছনে পেছনে উঠে আসছে বাকি সবাই, চেষ্টা করছে উর্ধ্বগতি রোধ করবার।

রয় সান্তানার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আর ইউ অল্ রাইট, লীডার? দেখতে পাচ্ছেন সাবমেরিনটা?'

ডান পাশে চাইতেই রুপোলী সাবমেরিনটা দেখতে পেল রানা। স্থির হয়ে বসে রয়েছে সাগরের নিচে। বিশ-পঁচিশ জন লোক দেখতে পেল সে, স্লেড নিয়ে প্রায় পৌঁছে গেছে সাবমেরিনের কাছে। প্রত্যেকের ওপর কমপ্রেস্ড এয়ার প্যাকের সিলিন্ডার, কিন্তু ব্যাটারিচালিত স্লেডকে ঠেলতে হচ্ছে বলে চলছে ওরা অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে।

'আমরা সাতজন চললাম আগে,' বলল রানা মাউথপিসে। 'স্লেডের কাছে পৌঁছেই আমরা সবাই কমপ্রেস্ড এয়ার প্যাক খুলে ফেলে দেব। ফলে সিলিন্ডারওয়ালা যাকে পাওয়া যাবে তাকেই খুন করতে পারব আমরা নিশ্চিন্তে—সেইম সাইড হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। বাদ বাকি সবাই আসুন পেছনে পেছনে।'

ছোট্ট একটা চাবি ঘোরাতেই দ্বিগুণ হয়ে গেল সাতজনের চলার গতি। গোলাবর্ষণে উদ্যত মিগ টোয়েন্টিওয়ানের মত তেরছাভাবে নেমে আসতে শুরু করল ওরা। প্রত্যেকের হাতে সিওটু গান প্রস্তুত।

বিশগজের মধ্যে পৌঁছতেই টের পেয়ে গেল ওরা। প্রায় একই সঙ্গে ঝট করে চাইল সবাই ওপর দিকে। ওপরে এবং পেছন দিকে থাকায় আন্ডারওয়াটার কমব্যাটে অনেক সুবিধে হবে ওদের, জানে রানা, কিন্তু এই মুহূর্তে আরও একটা সুবিধের কথা ভেবে খুশি হলো সে মনে মনে—মাথার ওপর প্রখর রোদ থাকায় ওপর দিকে চাইলেই চোখ ধাঁধিয়ে যাবে ওদের, নির্ভুলভাবে লক্ষ্যস্থির করা সম্ভব হবে না।

কয়েক গজ ওপর থেকে বর্শাগুলো মেরেই বন্দুকটা ফেলে ডাইভ দিয়ে নিচে নেমে এল রানা। ডান হাতে হাঙর মারার ছোরা, বামহাতে স্টিলেটো। পিঠের ওপর থেকে এয়ার প্যাকের সিলিন্ডার ফেলে দিয়েছে সে। প্রথমেই একটা গার্ডের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়ে ওর সিওটু গান কেড়ে নিয়ে আরেকজনের কণ্ঠনালী ছিদ্র করে দিল সে। বাঁ পাশে চেয়ে দেখল, একজনকে জাপটে ধরে তার মাস্ক খুলে ফেলবার চেষ্টা করছে রয় সান্তানা। স্লেড ছেড়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গার্ডরা চারপাশে। রানার দলের বাকি সবাই পৌঁছে গেছে ইতোমধ্যে। একমিনিটের মধ্যে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গেল পানির নিচে। নিজের দলের একজনকে দেখতে পেল রানা, ঘাড়ের পেছন দিয়ে রেল ইঞ্জিনের মত রক্তের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তলিয়ে যাচ্ছে।

পাথুরে মাটির ওপর নেমে এল রানা। স্লেডের দুইপাশে সিওটু গানে বর্শা ফিট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন গার্ড। ওপর থেকে বর্শা লাগানো একটা সিওটু গান এসে পড়ল পায়ের কাছে। ছোরাটা ফেলে দিয়ে চট করে বসে তুলে নিল রানা ওটা, তারপর বসে থাকা অবস্থা থেকেই লাফ দিল ওপর দিকে মাটি

থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে। কয়েকটা বুদ্বুদ দেখা দিল একজন গার্ডের হাতে বন্দুকের মাথায়। কাঁধের কাছে রাবার চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেল বর্শাটা। তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করল রানা কাঁধে, ভেজা ভেজা ঠেকল—রক্ত না পানি বোঝা গেল না ঠিক। চট করে ঘুরেই পাঁচফুট দূরে দাঁড়ানো দ্বিতীয় গার্ডের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে টিপে দিল সে ট্রিগার, কারণ হিসেব করে দেখেছে সে, দ্বিতীয় বর্শা পুরে তৈরি হওয়ার আগেই পৌঁছে যাবে সে প্রথম জনের কাছে, কাজেই ট্রিগার টেপার আগেই দ্বিতীয়জনকে খতম করে দিতে পারলে বর্শার ভয় আর থাকে না। ঘ্যাচ করে বিঁধল রানার বর্শাটা ঠিক জায়গা মত। পেছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল দ্বিতীয় গার্ড। ট্রিগার সে টিপল ঠিকই, কিন্তু রানার মাথার দুইহাত উঁচু দিয়ে চলে গেল বর্শাটা। এবার প্রথমজনকে সামলাবার জন্যে পাশ ফিরতেই প্রচণ্ড একটা আঘাত খেল সে কানের পাশে। বোঁ করে ঘুরে উঠল রানার মাথা। আবার চালাল গার্ড বন্দুকের বাঁট, ঠিক একই জায়গায়। রানার রিব্রিদার ধরে টানছে সে এবার, কনুই দিয়ে বার বার মেরে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে মাস্কের কাঁচ। বাঁ হাতে ধরা স্টিলেটো চালাল রানা অন্ধের মত। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে, লোকটার শরীরের কোথায় গিয়ে বিঁধছে ছুরিটা, আদৌ বিঁধছে কিনা, ঠিকমত ঠাহর করতে পারছে না রানা। যখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, দেখল অনর্থক মোরব্বা-কাচা করছে সে মরা লোকটাকে। মরে গেছে আগেই।

চারপাশে চাইল রানা। যুদ্ধ প্রায় শেষ। শত্রুপক্ষের বেশির ভাগই মারা পড়েছে, কয়েকজন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে, এখনও যে দু'একজন গার্ড রয়েছে, তাদের একেকজনকে ঘিরে ধরেছে তিন চারজন করে ডাইভার। সান্তানা ও তার চারজন সহকারী মিসাইল ব্রেনসহ স্লেডটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওপর দিকে। রানা ছুটল দলের কারও কোন সাহায্য দরকার কিনা দেখতে। চারপাশে মৃতদেহ, রক্ত, আর ঘোলা পানি দেখে বুঝতে পারল সে, যত শীঘ্রি সম্ভব কেটে পড়া দরকার এখান থেকে। রক্তের গন্ধ পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে হাঙরের দল।

ওপরে উঠতে উঠতে হাঁক ছাড়ল রানা, 'কারও কোন সাহায্য দরকার?'

কোন জবাব এল না কারও কাছ থেকে। শত্রুপক্ষের দুটো লাশ নেমে গেল নিচে রানার গা ঘেঁষে। ওপর দিকে চেয়ে টের পেল সে, সবাই উঠে যাচ্ছে, কেউ কোথাও আর থেমে নেই। তার মানে সব বাধা দূর হয়ে গেছে, নাকি অনতিক্রম্য কোন বাধার আভাস পেয়ে ভাগছে সবাই? বেশ অনেকটা উঠে গেছে রয় সান্তানা আর তার চারজন সঙ্গী স্লেড নিয়ে। নিচে চেয়ে দেখল তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুপোলী সাবমেরিনটা। কবির চৌধুরীর সঙ্গে ক্যাপ্টেনের কি কথাবার্তা হচ্ছে আঁচ করে নিয়ে মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

ঠিক এমনি সময়ে দেখতে পেল রানা সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। টাইগার শার্ক! এসে গেছে! একসঙ্গে দুটো! রাজকীয় চালে চলতে চলতে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে

গেল একটার শরীরে। অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে গিয়ে কপ্ করে কামড়ে ধরল একজন ডুবন্ত লোকের হাত। সঙ্গেরটাও কম যায় না। সেও ছুটে গিয়ে একটা পা কামড়ে ধরল। আরও কত লাশ রয়েছে, মনের সুখে খা যত খুশি, তা না, একটা নিয়েই কামড়াকামড়ি টানাহেঁচড়া শুরু করল দু'জনে মিলে। ভিতরে ভিতরে একবার শিউরে নিয়ে দ্রুত হাত-পা চালাল রানা ওপরে উঠে যাওয়ার জন্যে। ঠিক এমননি সময়ে কানে এল ওর ক্ষীণ একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর: 'বাঁচাও! হেল্প, হেল্প মি!'

রানা থেমে দাঁড়াতেই আরেকটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওর কানে। রয় সান্তানা। 'খবরদার! নামবেন না এখন! উঠে আসুন, লীডার! জলদি! নিচে শার্ক এসে গেছে···আরও আসছে!'

'প্লী···জ! প্লীজ হেল্প মি!'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ডিগবাজি খেয়ে নামতে শুরু করল রানা। বাঁ হাতে ধরা স্টিলেটোর দিকে চেয়ে হাসি পেল ওর। টাইগার শার্কের বিরুদ্ধে স্টিলেটো হচ্ছে সিংহের বিরুদ্ধে বানরের খামচি। কিন্তু উপায় কি? নিজেদের একজনকে এইভাবে ফেলে রেখে যেতে সে পারে না। হাঁক ছাড়ল, 'কোথায়? কোন্‌দিকে আপনি?'

'হ্যামারহেড! হ্যামারহেডের পাশে।'

বিশগজ দূরে হ্যামারহেডটাকে দেখতে পেল রানা এবার। একটা মৃতদেহ ধারাল দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে ওটাকে গিলে ফেলবার জন্যে কায়দায় আনবার চেষ্টা করছে মাথা ঝাঁকিয়ে। স্টিলেটো বাঁকিয়ে ধরে ছুটল রানা বাঁদিকে। হ্যামারহেড মনে করল ওর সঙ্গে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে আসছে আরেক হাঙর—পাঁই পাঁই ছুটল সে এঁকেবেঁকে।

পেট চেপে ধরে বাঁকা হয়ে কুঁকড়ে শুয়ে আছে একজন। কাঁচের ওপাশে চোখমুখ ব্যথায় বিকৃত। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে লোকটা একখণ্ড বড় পাথরের দিকে। মুহূর্তে বুঝে ফেলল রানা ব্যাপারটা। চট করে মাটি থেকে একহাত লম্বা একটা হাঙর-ছোরা তুলে নিল সে হাতে। কোপ দেয়ার ভঙ্গিতে চালাল সে ছোরাটা। অক্টোপাস। একটা হাত কাটা পড়তেই আরও দুটো হাত আহত লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে সাপের ফণার মত বাঁকা হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড ওই রকম বিস্ময় বিমূঢ় ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থেকে সড়াৎ করে ঢুকে পড়ল বিশাল অক্টোপাসটা তার গর্তের ভিতর।

লোকটার জখম পরীক্ষা করে বুঝতে পারল রানা, বাঁচবে—অবশ্য যদি জীবন্ত অবস্থায় ওপরে ভেসে ওঠা সম্ভব হয়। পিঠের এমন একটা জায়গায় বিঁধে রয়েছে বর্শাটা যেখানে অভ্যন্তরীণ মারাত্মক কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে খুব সম্ভব বেঁচে যাবে। হ্যাঁচকা টান দিতেই খুলে এল বর্শাটা।

এদিক ওদিক চেয়ে একটা লাশের পিঠ থেকে কমপ্রেস্‌ড্ এয়ার প্যাক খুলে নিয়ে বেঁধে নিল রানা নিজের পিঠে, তারপরই বাঁ হাতে লোকটাকে

জড়িয়ে ধরে কমপ্রেস্‌ড্‌ এয়ার আর পায়ের ফ্লিপার দুটোর তাড়নায় উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। ডান হাতে বাগিয়ে ধরে আছে সে ছোরাটা, সদা সতর্ক দৃষ্টি। প্রাণপণে চালাচ্ছে পা।

ওপরে উঠেই দেখতে পেল রানা একটা হাইড্রোফয়েলের ওপর স্লেডসহ ইলেকট্রোনিক ব্রেনটা তুলছে সান্তানা আর তার কয়েকজন সঙ্গী টানাহেঁচড়া করে। এত সূক্ষ্ম একটা জিনিস নিয়ে এরা সবাই মিলে যা করছে দেখলে নির্ঘাত হার্টফেল করত লি-বিউসের বৈজ্ঞানিকরা।

এদিকে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করতে করতে তীর থেকে এগিয়ে আসছে একটা হাইড্রোফয়েল। এরা স্টার্ট নেয়ার আগেই পৌঁছে যাবে। বাধা দেয়ার কেউ নেই। মুক্তি পেয়ে সব ডাইভার পালিয়েছে।

'বাজুকা!' চিৎকার করে উঠল রানা। 'আমাকে তুলবেন পরে। কেউ পারেন চালাতে? পেছনের ডেকে।'

'পারি,' উত্তর দিল রয় সান্তানা। এক লাফে চলে গেল সে পেছনের ডেকে।

প্রথমে আহত ডাইভার, এবং তারপর রানাকে টেনে তুলে ফেলা হলো হাইড্রোফয়েলে। ডাইভারদের নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল রানা, কি ব্যাপার। কেউ কোন উত্তর দেয়ার আগেই বুম করে ফুটল বাজুকা। ঝট্‌ করে চাইল সবাই অগ্রসরমান হাইড্রোফয়েলটার দিকে। চোখের সামনে চুরমার হয়ে গেল ওটা, দপ্‌ করে জ্বলে উঠল, পরমুহূর্তে তলিয়ে গেল নিচে।

'ওয়েল ডান!' ফিরে আসতেই পিঠ চাপড়ে দিল রানা রয় সান্তানার। 'একসেলেন্ট শট!'

কানে গিয়ে ঠেকল সান্তানার হাসি। হঠাৎ ডেকের ওপর চোখ পড়তেই মিলিয়ে গেল ওর মুখের হাসিটা। একলাফে চলে গেল সে আহত লোকটার পাশে। লোক না বলে একে ছোকরা বলাই উচিত। মাস্কটা খসিয়ে নেয়ায় দেখা যাচ্ছে বড়জোর আঠারো কি উনিশ বছর বয়স। জখমটা পরীক্ষা করেই উঠে দাঁড়াল সান্তানা। 'একেই তুলে আনতে নিষেধ করেছিলাম আমি আপনাকে! আমার ছেলে! হি ইজ মাই সান!' ঝাঁপিয়ে পড়ল সান্তানা রানার বুকের ওপর। দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল হাউমাউ করে। 'আজ থেকে আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে গেলাম, লীডার!'

একটা ফার্স্ট এইড বক্স জোগাড় করে ছোকরার জখম মেরামতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু'জন ডাইভার। রানা চলে এল কন্ট্রোল ককপিটে। 'স্টার্ট বোথ' লেখা একটা সুইচ টান দিতেই চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। ঠিক সেই সময়ে প্যানেলের একপাশে ফিট করা একটা ছোট্ট টিভি স্ক্রীনে ভেসে উঠল কবির চৌধুরীর মুখটা।

'ফিরে না এসে কোন উপায় নেই তোমার, মাসুদ রানা।' গমগম করে উঠল গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'মিসাইল ব্রেনটা ফেরত না দিলে সোহানা চৌধুরীকে

তুলে দেব আমি লি স্যুর হাতে।'

চমকে উঠল রানা। সোহানা কি বেঁচে আছে তাহলে! বেল্টের লাল বোতামটায় চাপ দিল সে।

'মিথ্যে বলার আর জায়গা পাওনি, কবির চৌধুরী! লি-বিউসের বিস্ফোরণে মারা গেছে সোহানা আজ দশটার সময়।'

'ওকে আগেই ধরে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।'

'মিথ্যে কথা!'

কবির চৌধুরীর ছবিটা সরে গেল স্ক্রীন থেকে। ঠিক তিন সেকেন্ড পর ফুটে উঠল পরিষ্কার সোহানার ছবি। একটা লম্বা টেবিলের ওপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে সোহানা। নগ্ন। পাশেই একটা ডাক্তারী ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে কুৎসিত হাসি হাসছে একটা বেলমাথা চীনাম্যান। সোহানার বুকের ওপর ছুরি দিয়ে ছোট্ট একটা খোঁচা দিল লোকটা, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে মুখ বিকৃত করল সোহানা, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে বুক বেয়ে নেমে এল একফোঁটা রক্ত। আবার শোনা গেল কবির চৌধুরীর গলা।

'ভীষণ কৌতূহল লি স্যুর। ও দেখতে চায় সত্যি সত্যিই মেয়েমানুষের হৃদয় বলে কিছু আছে কিনা। ব্রেনটা ফেরত দিলে, কথা দিচ্ছি, ছেড়ে দেব আমি সোহানাকে। নইলে···'

'তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি!' বলল রানা। 'এই মহিলা আর কেউ। সোহানা নয়। সোহানা মারা গেছে। মুখোশ। প্রফেসার ব্র্যান্ডের বাড়িতে আমার চেহারার একটা মুখোশ দেখেছি আমি। এটা সোহানার চেহারার অনুকরণে তৈরি মুখোশ পরা আর কোন মহিলা।'

'বোকার মত কথা বলছ তুমি, রানা। মুখোশ থাকলে মুখের ভাব পরিবর্তন সম্ভব নয়। তুমি দেখোনি···'

'ওসব ভাব-টাব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তবে বেনিফিট অভ ডাউট পেতে পারো তুমি। আসছি আমি! কিন্তু মিসাইল ব্রেন নিয়ে নয়। একা। ব্রেন যেখানে আছে সেখানেই থাকবে আপাতত। আমি এদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, যে মুহূর্তে আমাদের দু'জনকে সুস্থ শরীরে মাহমুদ বেগের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তীরের দিকে এগোতে দেখা যাবে, এরাও ধীরে ধীরে এগোবে তীরের দিকে। মিসাইল ব্রেন নামিয়ে দিয়ে উঠে পড়ব আমরা হাইড্রোফয়েলে।'

'যদি ব্রেন না নামিয়েই পালাবার চেষ্টা করো?'

'শূটিং রেঞ্জের মধ্যে অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তোমার লোক। আমরা কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলেই গুলি করে মেরে ফেলবে আমাদের। আর তোমরা যদি চালাকির চেষ্টা কর মিসাইল ব্রেন নিয়ে চলে যাবে আমার লোকেরা।'

'ফেয়ার এনাফ।' বলল কবির চৌধুরী। 'ঠিক আছে, এসো তুমি। আমি অপেক্ষা করছি।'

পনেরো

'মেইন গট্ (মাই গড)! তুমিও এদের দলে!'

প্রফেসার ব্র্যাডের কাঁপা গলা শোনা গেল কাঁচের ওপাশ থেকে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছেন তিনি ফ্রলিনের দিকে ওকে প্যাট্রিসিয়া মনে করে।

ওয়াইন ক্যাবিনেটের মধ্যে দিয়ে মই বেয়ে নিচে নেমেই ঘাড়ের পেছনে পিস্তলের ঠাণ্ডা নলের স্পর্শে টের পেয়েছে রানা, বন্দী করা হয়েছে ওকে। পিস্তলধারিণী আর কেউ নয়, ফ্রলিন লটেনবাক। লিফটে করে নামিয়ে আনা হয়েছে ওকে আনব্রেকেব্‌ল্ গ্লাস দিয়ে তৈরি মেইন কন্ট্রোল রুমের বাইরে। লিফটের দরজা খুলে যেতেই আঁৎকে উঠে চেঁচিয়ে উঠেছেন প্রফেসার ব্র্যাড।

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছে কবির চৌধুরী আর প্রফেসার আর্থার ব্র্যাড। একটা স্ক্রীনে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাবমেরিনটাকে। আরেকটায় হাইড্রোফয়েলের স্পষ্ট ছবি—ডাঙার দিকে মেশিনগান তাক করে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে রয় সান্তানা। কাঁচের এপাশে, লিফট থেকে বিশফুট মত দূরে একটা টেবিলের ওপর হাত-পা বাঁধা সোহানা। তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে নি স্যু—হাতে স্ক্যালপেল।

ঘাড়টা একবার এপাশ থেকে ওপাশে ফিরিয়ে সবই দেখল রানা, কিন্তু মনটা রয়েছে ওর প্রফেসারের এইমাত্র উচ্চারণ করা কথা ক'টায়। তাহলে কি ফ্রলিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা নেই প্রফেসারের? এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করতে পারে, কাজেই ব্যাপারটা একটু বুঝে নেয়া দরকার।

'ও আসলে ট্রিসা নয়, প্রফেসার!' বলে উঠল রানা। মনে মনে প্রার্থনা করল যেন বুড়ো শুনতে পায় ওর কথা। 'ট্রিসার যমজ বোন, ফ্রলিন লটেনবাক। ওর কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার, প্রফেসার? ট্রিসাকে যখন আপনি পালক-কন্যা হিসেবে নিয়েছিলেন, তখন আপনার ধারণা ছিল বাংকারের ওপর বোমা পড়ায় মারা গেছে ওর বাবা আর বোন। পরে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলেন যে মারা যায়নি ওরা?'

শুনতে পেয়েছেন প্রফেসার রানার কথা। ঝট করে মাথা তুলে চাইলেন তিনি রানার দিকে। কাঁপা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। সব মনে আছে। কিন্তু ট্রিসাকে কোনদিন জানতে দিইনি আমি এসব কথা। জানতে দিইনি যে ও আসলে লটেনবাকের মত একজন বিকৃতমস্তিষ্ক পথভ্রষ্ট বৈজ্ঞানিকের মেয়ে। আমার নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছি আমি ওকে। নকল বার্থ-সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিতে সে সময়ে আমার তেমন কোনই অসুবিধে হয়নি। কিন্তু একথা তুমি জানলে কি করে? কোথায় আমার প্যাট্রিসিয়া?'

এক সেকেন্ড দ্বিধা করল রানা খবরটা বুড়োকে দেয়া ঠিক হবে কিনা ভেবে, তারপর সিদ্ধান্ত নিল—বলাই উচিত। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখন, প্যাট্রিসিয়াকে বাঁচাতে গিয়েই এদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন প্রফেসার। ওঁর ক্ষতি করবার হুমকি দেখিয়েই তাঁকে বশে এনেছে কবির চৌধুরী। দুঃসংবাদটা দিলে বুড়ো আঘাত পাবেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত হয়ে যাবেন কবির চৌধুরীর নাগপাশ থেকে।

'ট্রিসা মারা গেছে, প্রফেসার,' বলল রানা। 'প্রয়োজন ফুরোতেই খুন করেছে ওরা ওকে।'

'মারা গেছে! ট্রিসা! আমার ট্রিসা মারা গেছে···খুন···' মাতালের মত টলে উঠলেন বৃদ্ধ। চোট খেয়ে লোকটা হার্টফেল না করে, সেই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা মনে মনে।

'লি স্যু, থামাও তো গর্দভটাকে।' গর্জে উঠল কবির চৌধুরী। 'মুখ বন্ধ করো ওর।'

ঝট করে লি স্যুর দিকে ফিরল রানা। বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছে লি স্যুর ঠোঁটের কোণে। কিভাবে রানার মুখ বন্ধ করতে হবে ভাল করেই জানা আছে ওর। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছটফট করে উঠল সোহানা। গাল দুটো কুঁচকে গেছে ব্যথায়। ঠোঁট কামড়ে ধরে আটকে রেখেছে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। পাকা শিল্পীর মত যেন তুলি বুলোচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে আলতো করে ছুরিটা ধরে নিজের নামটা লিখতে শুরু করেছে সে সোহানার তলপেটে। আঁচড়ের সঙ্গে সঙ্গেই সরু রক্তের রেখা দেখা দিচ্ছে একের পর এক। শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে উঠল রানার। এক্ষুণি তিন লাফে লি স্যুর কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করবে রানা টের পেয়ে কথা বলে উঠল ফ্রলিন।

'এক পা সামনে বাড়ালেই মারা পড়বে, মাসুদ রানা। তুমি আমার পিতৃহন্তা। বাধ্য কোরো না আমাকে। খুশি মনে ট্রিগার টিপব আমি।'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল রানা, যেন ত্যাগ করেছে সামনে ঝাঁপ দেয়ার মতলব। কবির চৌধুরীর দিকে ফিরল সে। আলগোছে টেবিল টেনিস বলের মত দেখতে গ্যাস-বম্বটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। বলল, 'এসবের কি অর্থ, কবির চৌধুরী? ইলেকট্রোনিক ব্রেনটা তোমার দরকার নেই?'

'আছে।' জবাব দিল কবির চৌধুরী। 'কিন্তু তার জন্যে তোমাদের ছেড়ে দেয়ার কোন দরকার নেই। এক্ষুণি দেখতে পাবে, চলতে শুরু করবে সাবমেরিন। আস্তে করে ডুবিয়ে দেয়া হবে হাইড্রোফয়েলটা। তারপর ব্রেনটা সাবমেরিনে তুলে নিতে কোনই অসুবিধে হবে না আমাদের।'

'তাহলে আমাকে ডেকে আনার কি অর্থ?'

'এখনও বুঝতে পারোনি?' হা হা করে হেসে উঠল কবির চৌধুরী। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল আবার। 'তোমার মৃত্যু দেখতে চাই আমি, রানা। নিজের চোখে। অনেক জ্বালাতন করেছ তুমি আমাকে গত কয়েকটা বছর।

যতবারই তোমার সাথে টক্কর লেগেছে আমার, দেখেছি, তোমার চেয়ে শতগুণ বেশি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পরাজয় হয়েছে আমার, ধ্বংস হয়ে গেছে আমার মহামূল্যবান সব সাধনার ধন। এবার তাই তোমাকে এড়িয়ে চলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। হরেক রকম ফন্দি-ফিকির করে তুমি উস্কাবার চেষ্টা করেছ আমাকে, গায়ে মাখিনি। ভেবেছিলাম পাশ কাটিয়ে যাব এবার তোমাকে। কিন্তু নিজে থেকে গায়ে পড়ে আমার গর্তে ঢুকেছ তুমি। ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষতি করে দিয়েছ আমার। এবার আমি সব কিছুর শেষ দেখতে চাই।'

বেপরোয়া হাসি হেসে উঠল রানা হঠাৎ। টিটকারির ভঙ্গিতে বলল, 'শেষে আবার গোল্লা খাবে না তো?' কথাটা বলেই আড়চোখে চাইল সে সোহানার দিকে। ইঙ্গিতটা ঠিকই বুঝেছে সোহানা। গ্যাসবম্বটাকে রসিকতা করে গোল্লা বলে ওরা অফিসের সবাই। সামান্য একটু মাথা নাড়তে দেখল রানা ওকে। দেখল লম্বা করে দম নিল সে একটা। রানা নিজেও দম নিয়েছে মস্ত একটা। দমটা আটকে রেখেই সবার অলক্ষ্যে পিংপং বলের গায়ে ছোট্ট একটা বোতামে চাপ দিল সে। অস্পষ্ট একটা হিস্ স্ স্ শব্দ করে অত্যন্ত দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিষাক্ত গ্যাস।

'না। এবার আর গোল্লা খাব না, রানা। এবার আমি এমন একটা জায়গায় রয়েছি যেখানে হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই ঢুকতে পারবে না তুমি। কোন ক্ষতি করতে পারবে না তুমি আমার। অথচ···আরে! কি হলো, ফ্রলিন!'

পাঁই করে ঘুরে এক থাবা দিয়ে কেড়ে নিল রানা ফ্রলিনের হাতে ধরা পিস্তলটা। বুকে হাত চেপে বসে পড়েছে ফ্রলিন ততক্ষণে, শুয়ে পড়ল এবার। বার কয়েক হাত-পা খিঁচিয়েই স্থির হয়ে গেল। ঝট করে পাশ ফিরেই গুলি করল রানা। প্রয়োজন ছিল না। চোখমুখ বিকৃত করে টলছিল লি স্যু, গুলি খেয়েই দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর।

একছুটে সোহানার পাশে চলে এল রানা। লি স্যুর হাত থেকে খসে পড়ে যাওয়া ছুরিটা তুলে নিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কাটতে শুরু করল সে ওর বাঁধন। সেই ফাঁকে চট করে চোখ তুলে দেখল ভয়ঙ্কর আকার ধারণা করেছে কবির চৌধুরীর মুখটা। জ্বলছে চোখজোড়া।

'এভাবে নিস্তার পাবে না তুমি, মাসুদ রানা!' দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে, 'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি!'

সামনে ঝুঁকে হাত বাড়াল সে একটা বোতামের দিকে। হঠাৎ খটাস করে প্রফেসার ব্র্যান্ডের ছড়িটা এসে পড়ল ওর হাতের কজির ওপর। চমকে উঠেই বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল কবির চৌধুরী ব্র্যান্ডের মুখের দিকে, কিন্তু সামলে নিয়ে বাধা দেয়ার আগেই বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল প্রফেসার একটা লাল বোতাম। পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কবির চৌধুরীর চেহারাটা। স্পীকারের মাধ্যমে ভেসে এল প্রফেসারের কাঁপা গলা: 'আঙুলটা সরাতে বাধ্য কোরো না আমাকে, চৌধুরী। তুমি জানো, বোতাম ছেড়ে দিলেই ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু, মায় তোমার এত সাধের

সাবমেরিনটাও।'

হাতের বাঁধন মুক্ত হতেই উঠে বসল সোহানা, ডানপাশে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ারের ওপর থেকে তুলে নিল জামাকাপড়গুলো। পায়ের বাঁধন মুক্ত করেই টেনে নামাল ওকে রানা টেবিল থেকে, ঠেলে নিয়ে চলল এলিভেটরের দিকে।

'জলদি করো, ইয়ংম্যান!' বললেন প্রফেসার ব্র্যান্ড। 'আর বেশিক্ষণ টিপে রাখতে পারব না বোতামটা। যত তাড়াতাড়ি পারো বেরিয়ে যাও প্রাসাদ ছেড়ে—সব ধসে পড়বে আমি এই বোতামটা ছেড়ে দিলেই।' তাহলে প্রফেসারের ভাগ্যে কি হবে ভেবে রানা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই ধমকে উঠলেন বৃদ্ধ। 'তোমাকে যা বলছি তাই করো হে, ছোকরা! আমার জন্যে ভাবতে হবে না তোমাকে। এই কাঁচের ঘরটা ধ্বংস হবে না কোন অবস্থাতেই। পরে মাটি খুঁড়ে বের করতে পারবে আমাদের।' হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে গেল প্রফেসারের। 'সাবধান! ওয়াচ আউট! তোমার পেছনে!'

এক ধাক্কায় সোহানাকে লিফটের ভিতর পাঠিয়ে দিয়ে এক হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হয়ে গেল রানা। সেই অবস্থায় বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরেই গুলি করল। জিমি ক্রিদারো। গর্জে উঠল জিমির হাতের রিভলভারটাও। প্রায় একই সঙ্গে গুলি করেছে দু'জন। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল রানার শরীরটা। হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ল পিস্তলটা। বগলের দুই ইঞ্চি ওপরে ঢুকেছে গরম সীসা। মুহূর্তে অবশ হয়ে গেছে গোটা হাত। আঁধার দেখছে সে চোখে। ধড়াস্ আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পারল মেঝেতে পড়ল ক্রিদারোর লাশ।

'আর পারছি না···বোতাম···জলদি!'

প্রফেসার ব্র্যান্ডের কণ্ঠস্বর শুনে সংবিৎ ফিরে পেয়ে টলতে টলতে ঢুকে পড়ল রানা লিফটের ভিতর। ওপরে উঠতে শুরু করল সেটা। ত্রস্তহাতে কাপড় পরে নিল সোহানা।

'বোকামি করছেন আপনি, প্রফেসার!' লিফটের ভিতরেও শোনা যাচ্ছে কবির চৌধুরীর কথাগুলো স্পীকারের মাধ্যমে! 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? বাজে লোকের একটা মিথ্যে কথায় কি পাগলামি শুরু করেছেন! মারা যায়নি ট্রিসা। মিথ্যে কথা বলেছে ও। ওকে সরিয়ে রেখেছি আমরা নিরাপদ দূরত্বে।'

'ভালই করেছ। যেটুকু দ্বিধা ছিল সেটুকুও দূর হয়ে গেল এবার আমার। মেয়ের জীবনের মায়া না করে কাজটা আগেই করা উচিত ছিল আমার। এখন যখন জানলাম হয় ট্রিসা মারা গেছে, নয়তো নিরাপদ দূরত্বে আছে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা কর্তব্য সম্পাদন, যাই বলো, করতেই হবে আমাকে।'

'এর ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে আমাদের, তা জানেন?'

'কিছু এসে যায় না। জীবনটা আসলে খুব একটা দামী কিছু নয়, চৌধুরী। ইস্স্ অবশ হয়ে আসছে···'

থামল লিফট। ছুটতে শুরু করল ওরা দু'জন। ডাইনিং হলে এসেই হাঁক

ছাড়ল রানা মাহমুদ বেগের উদ্দেশে: 'শিগ্‌গির বেরিয়ে আসুন। এক্ষুণি ধসে পড়বে বাড়িটা!'

নড়ে উঠল ঘরের কোণে দাঁড়ানো মূর্তিটা। পেছন থেকে বেরিয়ে এল ভীত সন্ত্রস্ত মাহমুদ বেগ। আবার ছুটল ওরা। রানার হাত বেয়ে কলকল করে নেমে আসছে তাজা রক্ত, টপটপ ঝরছে আঙুলের আগা থেকে।

প্রাসাদ আর সমুদ্র তীরের মাঝামাঝি এসেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল ওরা মাটির ওপর। ভূমিকম্পের মত ঝাঁকুনি খেল গোটা সিসি এলাকাটা। গুড়ুম গুড়ুম মেঘ গর্জনের মত আওয়াজ হলো মাটির নিচে। প্রাসাদের একটা অংশ ধসে পড়ল প্রচণ্ড শব্দে। তারপরেই স্থির।

যেমন আকস্মিক ভাবে শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল সব। একেবারে নিস্তব্ধ। যেন কিছুই হয়নি, যেন চিরকালই এমনি ভাঙা ছিল প্রাসাদটা।

উঠে দাঁড়াতেই আকাশের দিকে চোখ পড়ল ওদের।

'হেলিকপ্টার!' চেঁচিয়ে উঠল মাহমুদ বেগ।

টুলনের দিক থেকে সার বেঁধে বিশ-ত্রিশটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসছে এইদিকে। টপাটপ নামতে শুরু করল ওগুলো এখানে-ওখানে সেখানে। রানাদের সবচেয়ে কাছে যেটা নামল তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন ফিলিপ কার্টারেট। তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন—আরে, স্বপ্ন দেখছে নাকি রানা।—মেজর জেনারেল রাহাত খান!

রানা লক্ষ করল, উদ্বেগ ভারাক্রান্ত মুখ নিয়ে নামলেন মেজর জেনারেল প্লেন থেকে। কয়েক পা এগিয়েই রানা ও সোহানা দু'জনই বেঁচে আছে দেখতে পেয়ে মুহূর্তে উড়ে গেল তাঁর চেহারা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তার ছাপ। হাসি হাসি হয়ে উঠল মুখটা। কিন্তু আরও কয়েক পা এগিয়েই, যাতে কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ না পেয়ে যায় সেজন্যে, কঠোর করে ফেললেন তিনি চোখমুখ। আর কয়েক কদম এগিয়ে রক্ত দেখতে পেলেন তিনি রানার হাতে। মুহূর্তে স্পষ্ট উদ্বেগ ফুটে উঠল আবার বৃদ্ধের চেহারায়, নিজের অজান্তেই প্রায় দৌড়ে ছুটে এলেন তিনি রানার সামনে। বোঝার চেষ্টা করছেন জখমটা ঠিক কতখানি মারাত্মক।

বুঝল রানা সবই। মনে মনে হাসল সে। কিন্তু মুখটা নির্বিকার রেখে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল কড়া এক ধমকের প্রতীক্ষায়।